

যুগালিনী ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ।

বিভর্ষি ছাকারমনিবু তানাঃ
যুগালিনী হৈমোমিত্বাপরাগম্ ।*

দ্বাদশ সংস্করণ ।

JAYANTI PRESS : CALCUTTA.

1900.

মূল্য ১৫০ টাকা ।

PRINTED BY B. K. CHAKRAVARTI & BROTHERS,
JAYANTI PRESS :

25, PATALDANGA STREET, CALCUTTA, . .

AND

PUBLISHED BY UMACHARAN BANERJEE.

5, PRATAP CHANDRA CHATTERJEE'S LANE, CALCUTTA,

বঙ্গকবিকুলতিলক

শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু মিত্র

সুস্থপ্রধানকে

এই গ্রন্থ

প্রণয়োপহারস্বরূপ

উৎসর্গ করিলাম

প্রথম খণ্ড ।





সুপারিনিনী

প্রথম খণ্ড।

আচার্য্য।

একদিন প্রয়াগতীর্থে, গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে, অপূর্ব প্রাবৃটদিনান্তশোভা প্রকটিত হইতেছিল। প্রাবৃটকাল, কিন্তু মেঘ নাই, অথবা যে মেঘ আছে, তাহা স্বর্ণময় তরঙ্গমালাবৎ পশ্চিম গগনে বিরাজ করিতেছিল। সূর্য্য-দেব অস্ত্রে গমন করিয়াছিলেন। বর্ষার জলসঞ্চারে গঙ্গা-যমুনা উভয়েই সম্পূর্ণশরীরীরা, যৌবনের পরিপূর্ণতার উন্মাদিনী, যেন ছুই ভগিনী ক্রীড়াচ্ছলে পরস্পরে

স্বালিঙ্গন করিতেছিল । চঞ্চল বসনাগ্রভাগবৎ তরঙ্গমালা পবনতাড়িত হইয়া কূলে প্রতিঘাত করিতেছিল ।

একখানি ক্ষুদ্র তরনীতে দুইজন মাত্র নাবিক । তরনী অসঙ্গত সাহসে সেই দুর্দমনীয় যমুনার স্রোতোবেগে আরোহণ করিয়া, প্রয়াগের ঘাটে আসিয়া লাগিল । একজন নৌকার রহিল, একজন তীরে নামিল । যে নামিল, তাহার নবীন যৌবন, উন্নত বলিষ্ঠ দেহ, বোদ্ধবেশ । মস্তকে উষ্ণীষ, অঙ্গে কবচ, করে ধনুর্কাণ, পৃষ্ঠে তুণীর, চরণে অনুপদীনা । এই বীরাকার পুরুষ পরম সুন্দর ! ঘাটের উপরে, সংসারবিরাগী গুণ্যপ্রয়াসীদিগের কতকগুলি আশ্রম আছে । তন্মধ্যে একটা ক্ষুদ্র কুটীরে এই যুবা প্রবেশ করিলেন ।

কুটীরमध्ये এক ব্রাহ্মণ কুশাসনে উপবেশন করিয়া জপে নিযুক্ত ছিলেন ; ব্রাহ্মণ অতি দীর্ঘাকার পুরুষ, শরীর শুষ্ক ; আয়ত মুখমণ্ডলে শ্বেতশ্মক বিরাজিত ; ললাট ও বিরলকেশ তালুদেশে অল্পমাত্র কিভৃতিশোভা । ব্রাহ্মণের কাণ্ডি গম্ভীর এবং কটাক্ষ কঠিন ; দেখিলে তাঁহাকে নির্দয় বা অভক্তিভাজন বলিয়া বোধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, অথচ শঙ্কা হইত । আগন্তুককে দেখিবামাত্র তাঁহার সে পুরুষভাব যেন দূর হইল, মুখের

গান্ধীর্যামধ্যে প্রসাদের সঞ্চার হইল। আগন্তুক, ব্রাহ্মণকে, প্রণাম করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ব্রাহ্মণ আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন,

“বৎস হেমচন্দ্র, আমি অনেক দিবসাবধি তোমার প্রতীক্ষা করিতেছি।”

হেমচন্দ্র বিনীতভাবে কহিলেন, “অপরাধ গ্রহণ করিবেন না, দিল্লীতে কার্য্য সিদ্ধ হয় নাই। পরন্তু যবন আমার পশ্চাদগামী হইয়াছিল; এই জন্য কিছু সতর্ক হইয়া আসিতে হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত বিলম্ব হইরাছে।”

ব্রাহ্মণ কহিলেন, “দিল্লীর সংবাদ আমি সকল শুনিয়াছি। বখ্তিয়ার খিলজিকে হাতীতে মারিত, ভালই হইত, দেবতার শত্রু পশু-হস্তে নিপাত হইত। তুমি কেন তার প্রাণ বাঁচাইতে গেলি!”

হেমচন্দ্র। তাহাকে স্বহস্তে বুদ্ধে মারিব বলিয়া। সে আমার পিতৃশত্রু, আমার পিতার রাজ্যচোর। আমারই সে বধ্য।

ব্রাহ্মণ। তবে তাহার উপর যে হাতী রাগিয়া আক্রমণ করিয়াছিল, তুমি বখ্তিয়ারকে না মারিয়া সে হাতীকে মারিলে কেন?

হেমচন্দ্র। আমি কি চোরের মত বিনা বুদ্ধে শত্রু

মারিব ? আমি মগধবাজেতাকে যুদ্ধে জয় করিয়া পিতার রাজ্য উদ্ধার করিব। নহিলে আমার মগধ-রাজপুত্র নামে কলঙ্ক ।

ব্রাহ্মণ কিঞ্চিৎ পরুষভাবে কহিলেন, “এ সকল ঘটনা ত অনেক দিন হইয়া গিয়াছে, ইহা পূর্বে তোমার এখানে আমার সম্ভাবনা ছিল। তুমি কেন বিলম্ব করিলে ? তুমি মথুরায় গিয়াছিলে ?”

হেমচন্দ্র অধোবদন হইলেন, “কেন কহিলেন, “বুঝিলাম তুমি মথুরায় গিয়াছিলে, আমার নিষেধ গ্রাহ্য কর নাই। যাহাকে দেখিতে মগধরাজ গিয়াছিলে, তাহাকে কি সাক্ষাৎ পাইয়াছ ?”

এবার হেমচন্দ্র রক্ষভাবে কহিলেন, “সাক্ষাৎ যে পাইলাম না, সে আপনারই দর। মৃগালিনীকে আপনি কোথায় পাঠাইয়াছেন ?”

মাধবাচার্য্য কহিলেন, “আনি যে কোথায় পাঠাইয়াছি, তাহা তুমি কি প্রকারে সিদ্ধান্ত করিলে ?”

হে। মাধবাচার্য্য ভিন্ন এ ময়না কাহার ? আমি মৃগালিনীর ধাত্রীর মুখে শুনিলাম যে, মৃগালিনী আমার আঙ্গটি দেখিয়া কোথায় গিয়াছে, আর তাহার উদ্দেশ্য নাই। আমার আঙ্গটি আপনি পাথের জন্ত চাহিয়া

লইয়াছিলেন। আঙ্গটির পরিবর্তে অল্প রত্ন দিতে চাইয়াছিলাম, কিন্তু আপনি লন নাই। তখনই আমি সন্ধিহানি হইয়াছিলাম, কিন্তু আপনাকে অদের আমার কিছুই নাই, এই জন্তই বিনা বিবাদে আঙ্গটি দিয়াছিলাম। কিন্তু আমার সে অসতর্কতার আপনিই সমুচিত প্রতিকল দিরাছেন।

মাধবাচার্য্য কহিলেন, “যদি তাহাই হয়, আমার উপর রাগ করিও না। তুমি দেবকার্য্য না সাধিলে কে সাধিবে? তুমি যবনকে না তাড়াইলে কে তাড়াইবে? যবননিপাত তোমার একমাত্র ধ্যানস্বরূপ হওয়া উচিত। এখন যুগালিনী তোমার মন অধিকার করিবে কেন? একবার তুমি যুগালিনীর আশায় মথুরায় বসিয়া ছিলে বলিয়া তোমার বাপের রাজ্য হারাইয়াছ; যবনাগমনকালে হেমচন্দ্র যদি মথুরায় না থাকিয়া মগধে থাকিত, তবে মগধজয় কেন হইবে? আবার কি সেই যুগালিনী-পাশে-বদ্ধ হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবে? মাধবাচার্য্যের জীবন থাকিত তাহা হইবে না। সুতরাং যেখানে থাকিলে তুমি যুগালিনীকে পাইবে না, আমি তাহাকে সেইখানে রাখিয়াছি।”

হে। আপনার দেবকার্য্য আপনি উদ্ধার করুন; আমি এই পর্য্যন্ত।

মা । “তোমার দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছে । এই কি তোমার দেবভক্তি ? ভাল, তাহাই না হউক ; দেবতার আশ্রয় সাধন জন্য তোমার শ্রম মন্থনের সাহায্যের অপেক্ষা করেন না । কিন্তু তুমি কাপুরুষ যদি না হও, তবে তুমি কি প্রকারে শত্রুশাসন হইতে অবসর পাইতে চাও ? এই কি তোমার বীরগর্ভ ? এই কি তোমার শিক্ষা ? রাজবংশে জন্মিয়া কি প্রকারে আপনার রাজ্যোদ্ধারে নিমুখ হইতে চাহিতেছ ?

হে । রাজ্য—শিক্ষা—গর্ভ অতল জলে ডুবিয়া যাউক ।

মা । নরাধম ! তোমার জননী কেন তোমায় দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করিয়া মরণভোগ করিয়াছিল ? কেনই বা দ্বাদশ বর্ষ দেবারাধনা ত্যাগ করিয়া এ পাষাণকে সকল বিদ্যা শিখাইলাম ?

মাধবাচার্য্য অনেকক্ষণ নীরবে করলথকপোল হইয়া রহিলেন ! ক্রমে হেমচন্দ্রের অনিন্দ্য গৌর মুখকান্তি মধ্যাহ্ন-মরীচি-বিশোধিত স্থলপদ্যবৎ আরক্তবর্ণ হইয়া আসিতেছিল ; কিন্তু গর্ভাধিগিরি-শিখর তুল্য, তিনি স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন । পরিশেষে মাধবাচার্য্য কহিলেন, “হেমচন্দ্র, ধৈর্য্যাবলম্বন কর । মৃগালিনী কোথায়

তাহা বলিল—মৃগালিনীর সহিত তোমার বিবাহ দেওয়াইব ।
কিন্তু এক্ষণে আমার পরামর্শের অনুবর্তী হও, আগে
আপনার কাজ সাধন কর ।”

হেমচন্দ্র কহিলেন, “মৃগালিনী কোথায় না বলিলে
আমি নবনবধের জন্য অস্ত্র স্পর্শ করিব না ।”

মাধবাচার্য্য কহিলেন, “আর যদি মৃগালিনী মরিয়া
থাকে ?”

হেমচন্দ্রের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল ।
তিনি কহিলেন, “তবে সে আপনারই কাজ ।” মাধবাচার্য্য
কহিলেন, “আমি স্বীকার করিতেছি, আমিই দেবকাষ্যের
কণ্টককে বিনষ্ট করিয়াছি ।”

হেমচন্দ্রের মুখকান্তি বর্ষগোমুখ মেঘবৎ হইল । ব্রহ্ম-
হস্তে ধনুকে শরসংযোগ করিয়া কহিলেন, “যে মৃগালিনীর
বধকর্তা, সে আমার বধ্য । এই শরে গুরুহত্যা ব্রহ্মহত্যা
উভয় ছাফিয়া সাধন করিব ।”

মাধবাচার্য্য হাস্য করিলেন, কহিলেন, “গুরুহত্যায়
ব্রহ্মহত্যায় তোমার যত আমোদ, জীহত্যায় আমার তত
নহে । এক্ষণে তোমাকে পাতকের ভাগী হইতে হইবে
না । মৃগালিনী জীবিতা আছে । পার, তাহার সন্ধান
করিয়া সাফাৎ কর । এক্ষণে আমার আশ্রম হইতে

- স্থানান্তরে যাও । আশ্রম কলুষিত করিও না ; অপাত্রে আমি কোন ভার দিই না ।” এই বলিয়া মাধবাচার্য্য পূর্ববৎ জপে নিযুক্ত হইলেন ।

হেমচন্দ্র আশ্রম হইতে নির্গত হইলেন । ঘাটে আসিয়া ক্ষুদ্র তরণী আরোহণ করিলেন । যে দ্বিতীয় ব্যক্তি নৌকায় ছিল, তাকে বলিলেন “দিগ্বিজয় ! নৌকা ছাড়িয়া দাও ।”

দিগ্বিজয় বলিল “কোথায় যাইব ?” হেমচন্দ্র বলিলেন, “যেখানে ইচ্ছা—যমালয় ।”

দিগ্বিজয় প্রভুর স্বভাব বৃষ্টিত । অক্ষুটস্বরে কহিল, “সেটা অল্প পথ ।” এই বলিয়া সে তরণী ছাড়িয়া দিয়া স্রোতের প্রতিকূলে বাহিতে লাগিল ।

- হেমচন্দ্র অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া শেষে কহিলেন, “দূর হউক ! ফিরিয়া চল ।”

- দিগ্বিজয় নৌকা ফিরাইয়া পুনরপি প্রয়াগের ঘাটে উপনীত হইল । হেমচন্দ্র লক্ষ্যে তীরে অবতরণ করিয়া পুনর্বার মাধবাচার্য্যের আশ্রমে গেলেন ।

ঠাহাকে দেখিয়া মাধবাচার্য্য কহিলেন, “পুনর্বার কেন আসিয়াছ ?”

হেমচন্দ্র কহিলেন, “আপনি বাহা বলিবেন, তাহাই

স্বীকার করিব। মৃগালিনী কোথায় আছে 'আজ্ঞা করুন।' .

মা। তুমি সত্যবাদী—আমার আজ্ঞাপালন করিতে স্বীকার করিলে, ইহাতেই আমি সন্তুষ্ট হইলাম। গোড়নগরে এক শিমোর বাগীতে মৃগালিনীকে রাখিয়াছি। তোমাকেও সেই প্রদেশে বাহিতে হইবে, কিন্তু তুমি তাহার সাফাৎ পাইবে না। শিষ্যের প্রতি আমার বিশেষ আজ্ঞা আছে যে, যতদিন মৃগালিনী তাঁহার গৃহে থাকিবে, ততদিন সে পুক্যান্ডরের সাফাৎ না পায়।

হে। সাফাৎ না পাই, বাহা বলিলেন, ইহাতেই আমি চরিতার্থ হইলাম। এক্ষণে কি কার্য্য করিতে হইবে অনুমতি করুন।

মা। তুমি দিল্লী গিয়া যবনের মন্ত্রণা কি জানিয়া আসিয়াছ ?

হে। যবনেরা বঙ্গবিজয়ের উদ্যোগ করিতেছে। অতি ছরায় বখতিয়ার খিলজি সেনা লইয়া, গোড়ে যাত্রা করিবে।

মাধবাচার্য্যের মুখ হর্ষপ্রকুল হইল। তিনি কহিলেন, "এত দিনে বিধাতা বৃষ্টি এ দেশের প্রতি সদয় হইলেন।"

হেমচন্দ্র একতানমনে মাধবাচার্য্যের প্রতি চাহিয়া

তাঁহার কথার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । মাধবাচার্য্য বলিতে লাগিলেন,

“করমাস পর্য্যন্ত আমি কেবল গণনার নিযুক্ত আছি । গণনার যাহা ভবিষ্যৎ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহা ফলিবার উপক্রম হইয়াছে ।”

হেম । কি প্রকার ?

মা । গণিয়া দেখিলাম যে, যবনসাম্রাজ্য-ধ্বংস বঙ্গরাজ্য হইতে আরম্ভ হইবে ।

হে । তাহা হইতে পারে । কিন্তু কতকালেই বা তাহা হইবে ? আর কাহা কর্তৃক ?

মা । তাহাও গণিয়া স্থির করিয়াছি । যখন পশ্চিম-দেশীয় বণিক বঙ্গরাজ্যে অস্ত্রধারণ করিবে, তখন যবনরাজ্য উৎসন্ন হইবেক ।

হে । তবে আমার জয়লাভের কেহা সম্ভাবনা ? আমি ত বণিক নহি ।

মা । তুমিই বণিক । মথুরায় যখন তুমি মৃগালিনীর প্রয়াসে দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলে, তখন তুমি কি ছলনা করিয়া তথায় বাস করিতে ?

হে । আমি তখন বণিক বলিয়া মথুরায় পরিচিত ছিলাম বটে ।

মা । স্মতরাং তুমিই পশ্চিমদেশীয় বণিক । গোর্ড
রাজ্যে গিয়া তুমি অস্ত্রধারণ করিলেই যবননিপাত হইবে ।
তুমি আমার নিকট প্রতিশ্রুত হও সে, কাল প্রাতেই
গোড়ে যাত্রা করিবে । যে পর্য্যন্ত সেখানে না যবনের
সহিত যুদ্ধ কর, সে পর্য্যন্ত মৃগালিনীর সহিত সাক্ষাৎ
করিবে না ।

হেমচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, “তাহাই
স্বীকার করিলাম । কিন্তু একা যুদ্ধ করিয়া কি
করিব ?”

মা । গোড়েখরের সেনা আছে ।

হে । থাকিতে পারে—সে বিষয়েও কতক সন্দেহ ;
কিন্তু যদি থাকে, তবে তাহারা আমার অধীন হইবে
কেন ?

মা । তুমি আগে যাও । নবদ্বীপে আমার সহিত
সাক্ষাৎ হইবে । সেইখানে গিয়া ইহার বিহিত উদ্যোগ
করা যাইবে । গোড়েখরের নিকট আমি পরিচিত
আছি ।

“যে আজ্ঞা” বলিয়া হেমচন্দ্র প্রণাম করিয়া বিদায়
হইলেন । যতক্ষণ তাঁহার স্বীকৃতি নগ্ননগোচর হইতে
লাগিল, আচার্য্য ততক্ষণ ভৎপ্রতি অনিমেষলোচনে

চাঁহিয়া রহিলেন । আর যখন হেমচন্দ্র অদৃশ্য হইলেন,
মাধবাচার্য্য মনে মনে বলিতে লাগিলেন,

“মাও, বৎস ! প্রতি পদে বিজয়লাভ কর । যদি
ব্রাহ্মণবংশে আমার জন্ম হয়, তবে তোমার পদে কুশাহুরও
বিশ্বাসে না । মৃগালিনী ! মৃগালিনী পাখী আমি তোমারই
জন্মে পিঞ্জরে বাধিয়া রাখিয়াছি । কিন্তু কি জানি, পাছে
তুমি তাহার কলধ্বনিতে মুগ্ধ হইয়া বড় কাজ ভুলিয়া যাও,
এইজন্য তোমার পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা ব্রাহ্মণ তোমাকে
কিছুদিনের জন্য মনঃপীড়া দিতেছে ।”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

পিঞ্জরের বিহঙ্গী ।

লক্ষ্মণাদিত্য-।নবাসী হৃষীকেশ সম্পন্ন বা দরিদ্র ব্রাহ্মণ
নাহেন । তাঁহার বাসগৃহের বিলক্ষণ সৌষ্ঠব ছিল । তাঁহার
অন্তঃপুরমধ্যে যথায় দুইটা তরুণী কক্ষ প্রাচীরে আলেখ্য
লিখিতেছিলেন, . তথায় পাঠক মহাশয়কে দাঁড়াইতে

হইবে। উভয় রমণীই আত্মকর্মে সবিশেষ মনোভি-
মিবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তন্নিবন্ধন পরস্পরের সঙ্কিত
কথোপকথনের কোন বিঘ্ন জন্মিতেছিল না। সেই
কথোপকথনের মধ্যভাগ হইতে পাঠক মহাশয়কে শুনাইতে
আরম্ভ করিব।

এক যুবতী অপরকে কহিলেন, “কেন, মণিমালিনী!
কথায় উত্তর দিস্ না কেন ? আমি সেই রাজপুত্রটার কথা
শুনিতো ভালবাসি।”

“সই মণিমালিনী ! তোমার সুখের কথা বল, আমি
আনন্দে শুনিব।”

মণিমালিনী কহিল, “আমার সুখের কথা শুনিতো
শুনিতো আমিই জানাতন হইয়াছি, তোমাকে কি
শুনাইব ?”

মৃ। তুমি শোন কার কাছে—তোমার স্বামী
কাজে ?

মণি। নহিলে আর কারও কাছে বড় শুনিতো পাই
না। এই পদ্মটী কেমন আঁকিলাম দেখ দেখি ?

মৃ। ভাল হইয়াও হয় নাই। জল হইতে পদ্ম
অনেক উদ্ধে আছে, কিন্তু সুরোবরে সেরূপ থাকে না ;
পদ্মের বোঁটা জলে লাগিয়া থাকে, চিত্রেও সেইরূপ হইবে।

আর কয়েকটা পদ্যপত্র আঁক ; নহিলে পদ্যের শোভা স্পষ্ট হয় না। আরও, পার যদি উহার নিকট একটা রাজহাঁস আঁকিয়া দাও ।

মণি । হাঁস এখানে কি করিবে ?

মৃ । তোমার স্বামীর মত পদ্যের কাছে সুখের কথা কহিবে ।

মণি । (হাসিয়া) দুই জনেই সুকণ্ঠ বটে। কিন্তু আমি হাঁস লিখিব না। আমি সুখের কথা শুনিয়া শুনিয়া জ্বালাতন হইয়াছি ।

মৃ । তবে একটা খঞ্জন আঁক ।

মণি । খঞ্জন আঁকিব না। খঞ্জন পাখা বাহির করিয়া উড়িয়া যাইবে। এ ত মৃগালিনী নহে যে, স্নেহ-শিকলে বাঁধিয়া রাখিব ।

মৃ । খঞ্জন যদি এমনই ছুঁট হয়, তবে মৃগালিনীকে যেমন পিঞ্জরে পূরিয়াছ খঞ্জনকেও সেইরূপ করিও !

ম । আমরা মৃগালিনীকে পিঞ্জরে পূরি নাই—সে আপনি আসিয়া পিঞ্জরে ঢুকিয়াছে ।

মৃ । সে মাধবাচার্য্যের গুণ ।

ম । সখি ! তুমি কতবার বলিয়াছ যে, মাধবাচার্য্যের সেই নিষ্ঠুর কাজের কথা সবিশেষ বলিবে। কিন্তু কই,

আজও বলিলে না। কেন তুমি মাধবাচার্য্যের কথায় পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া আসিলে ?

ম। মাধবাচার্য্যের কথায় আসি নাই। মাধবাচার্য্যকে আমি চিনিভাম না। আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক এখানে আসি নাই। এক দিন সন্ধ্যার পর, আমার দাসী আমাকে এই আঙ্গুটি দিল; এবং বলিল যে, গিনি এই আঙ্গুটি দিয়াছেন, তিনি ফলবাগানে অপেক্ষা করিতেছেন। আমি দেখিলাম যে, উহা হেমচন্দ্রের সঙ্কেতের আঙ্গুটি। তাহার সঙ্কেতের অভিল্য থাকিলে তিনি এই আঙ্গুটি পাঠাইয়া দিতেন। আমাদের বাটার পিছনেই বাগান ছিল। যখন হইতে শীতল বাতাস সেই বাগানে নাচিয়া বেড়াইত। তথায় তাহার সঙ্কিত সাক্ষাৎ হইত।

নির্ণয়মাগিনী কহিলেন, “ঐ কথাটা মনে পড়িলেও আমার বড় অসুখ হয়। • তুমি কুমারী হইয়া কি প্রকারে পুরুষের সহিত গোপনে প্রণয় করিতে ?”

ম। অসুখ কেন সখি—তিনি আমার স্বামী। তিনি ভিন্ন অন্য কেহ কখন আমার স্বামী হইবে না।

ম। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ত তিনি স্বামী হয়েন নাই। রাগ করিও না সখি! তোমাকে ভগিনীর আয় ভালবাসি; এই জন্ত বলিতেছি।

মৃগালিনী অধোবদনে রহিলেন । ঋণেক পরে চক্ষুর জল মুছিলেন । কহিলেন, “মণিমালিনি ! এ বিদেশে আমার আত্মীয় কেহ নাই । আমাকে ভাল কথা বলে এমন কেহ নাই । যাহারা আমাকে ভালবাসিত, তাহা দিগের সহিত যে, আর কখনও সাফাৎ হইবে, সে ভরসাও করি না । কেবলমাত্র তুমি আমার সখী—তুমি আমাকে ভাল না বাসিলে কে, আর ভালবাসিলে ?”

ম । আমি তোমাকে ভালবাসিব, বাসিয়াও থাকি, কিন্তু যখন ঐ কথাটী মনে পড়ে, তখন মনে করি—

মৃগালিনী পুনশ্চ নীরবে রোদন করিলেন । কহিলেন “সখি, তোমার মুখে এ কথা আমার মনে হয় না । যদি তুমি আমার নিকটে শপথ কর যে তাহা বলিব তাহা এ সংসারে কাহারও নিকটে বাস্তব করিবে না, তবে তোমার নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি । তাহা হইলে তুমি আমাকে ভালবাসিবে ।”

ম । আমি শপথ করিতেছি ।

মৃ । তোমার চুলে দেবতার ফুল আছে । তাহা ছুঁয়ে শপথ কর ।

মণিমালিনী তাই করিলেন ।

তখন মৃগালিনী মণিমালিনীর কাণে হাহা কহিলেন,

তাহার এক্ষণে বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। শ্রবণে মণিমালিনী পরম প্রীতি প্রকাশ করিলেন। গোপন-কথা সমাপ্ত হইল।

মণিমালিনী কহিলেন, “তাহার পর, মাধবাচার্য্যের সঙ্গে তুমি কি প্রকারে আসিলে? সে বৃত্তান্ত বলিতেছিলে বল!”

মণিমালিনী কহিলেন, “আমি হেমচন্দ্রের আঙ্গুটি দেখিয়া তাঁকে দেখিবার ভরসায় বাগানে আসিলে দূতী কহিল যে, রাজপুত্র নৌকায় আছেন, নৌকা তীরে লাগিয়া রহিয়াছে। আমি অনেক দিন রাজপুত্রকে দেখি নাই। বড় ব্যগ্র হইয়াছিলাম, তাই বিবেচনাশূন্য হইলাম। তীরে আসিয়া দেখিলাম যে, যথার্থই একখানি নৌকা লাগিয়া রহিয়াছে। তাহার বাহিরে একজন পুরুষ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, মনে করিলাম যে, রাজপুত্র দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আমি নৌকার নিকট আসিলাম। নৌকার উপর গিনি দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি আমার হাত ধরিয়া নৌকায় উঠাইলেন। অমনি নাবিকেরা নৌকা খুলিয়া দিল। কিন্তু আমি স্পর্শেই বুঝিলাম যে এ ব্যক্তি হেমচন্দ্র নহে।”

মণি। আর অমনি তুমি চীৎকার করিলে?

মৃ। চীৎকার করি নাই। একবার ইচ্ছা করিয়াছিল
বটে, কিন্তু চীৎকার আসিল না।

মণি। আমি হইলে জলে বাঁপ দিতাম।

মৃ। হেমচন্দ্রকে না দেখিয়া কেন মরিব ?

মণি। তার পর কি হইল ?

মৃ। প্রথমেই সে ব্যক্তি আমাকে “মা” বলিয়া বলিল,
“আমি তোমাকে মাতৃসম্বোধন করিতেছি—আমি তোমার
পুত্র, কোন আশঙ্কা করিও না। আমার নাম মাধনা
চার্য্য, আমি হেমচন্দ্রের পুত্র। কেবল হেমচন্দ্রের পুত্র
এমত নহি; ভারতবর্ষের রাজগণের মধ্যে অনেকের
সহিত আমার সেই সম্বন্ধ। আমি এখন কোন দৈবকাণ্ডে
নিযুক্ত আছি, তাহাতে হেমচন্দ্র আমার পুত্রের মতঃ
তুমি তাহার প্রধান বিদ্বান্।”

আমি বলিলাম, “আমি বিদ্বান্?” মাধনাচার্য্য কহিলেন,
“তুমিই বিদ্বান্। যবনদিগের জয় করা, হিন্দুরাজ্যের পুন-
রুদ্ধার করা সুসাধ্য কন্ড নহে; হেমচন্দ্র ব্যতীত কাহারও
সাধ্য নহে; হেমচন্দ্রও অনগমন্য না হইলে তাঁর দ্বারাও
এ কাজ সিদ্ধ হইবে না। যত দিন তোমার মাগ্গাংসান
সুলভ থাকিবে, তত দিন হেমচন্দ্রের তুমি ভিন্ন অন্য ব্রত
নাই—সুতরাং যবন মারে কে?” আমি কহিলাম,

“বুঝিলাম প্রথমে আমাকে না মারিলে যখন মারা হইবে না। আপনার শিষ্য কি আপনার দ্বারা আঙ্গুটি পাঠাইয়া দিয়া আমাকে মরিতে আজ্ঞা করিয়াছেন ?”

মণি । এত কথা বুড়াকে বলিলে কি প্রকারে ?

মৃ । আমার বড় রাগ হইয়াছিল, বুড়ার কথায় আমার হাড় জলিয়া গিয়াছিল, আর বিপৎকালে লজ্জা কি ? মাধবাচার্য্য আমাকে মুখরা মনে করিলেন, মৃদু হাসিলেন, কহিলেন, “আমি যে তোমাকে এইরূপে হস্তগত করিব, তাহা হেমচন্দ্র জানেন না ।”

আমি মনে মনে কহিলাম, তবে যাঁহার জন্ত এ জীবন রাখিয়াছি, তাঁহার অনুমতি ব্যতীত সে জীবন ত্যাগ করিব না। মাধবাচার্য্য বলিতে লাগিলেন, “তোমাকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে না—কেবল আপাততঃ হেমচন্দ্রকে ত্যাগ করিতে হইবে। ইহাতে তাঁহার পরম মঙ্গল। যাহাতে তিনি রাজ্যেশ্বর হইয়া তোমাকে রাজমহিষী করিতে পারেন, তাহা কি তোমার কর্তব্য নহে ? তোমার প্রণয়মস্ত্রে তিনি কাপুরুষ হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার সে ভাব দূর করা কি উচিত নহে ?” আমি কহিলাম, “আমার সহিত সাক্ষাৎ যদি তাঁহার অমুচিত হয়, তবে তিনি কদাচ আমার সহিত আর সাক্ষাৎ

করিবেন না ।” মাধবাচার্য্য বলিলেন, “বালকে ভাবিয়া থাকে, বালক ও বুড়া উভয়ের বিবেচনাশক্তি তুল্য ; কিন্তু তাহা নহে । হেমচন্দ্রের অপেক্ষা আমাদিগের পরিণামদর্শিতা যে বেশী, তাহাতে সন্দেহ করিও না । আর তুমি সম্মত হও বা না হও, যাহা সঙ্কল্প করিয়াছি তাহা করিব । আমি তোমাকে দেশান্তরে লইয়া যাইব । গোড় দেশে অতি শান্তস্বভাব এক ব্রাহ্মণের বাটীতে তোমাকে রাখিয়া আসিব । তিনি তোমাকে, আপন কন্যার স্থায় বহু করিবেন । এক বৎসর পরে আমি তোমার পিতার নিকট তোমাকে আনিয়া দিব । আর সে সময়ে হেমচন্দ্র যে অবস্থায় থাকুন, তোমার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দেওয়াইব, ইহা সত্য করিলাম ।” “এই কথাতেই হউক, আর অগত্যাই হউক, আমি নিস্তক হইলাম । তাহার পর এইখানে আসিয়াছি । ও কি ও সেই ?”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

ভিখারিণী ।

সখীদ্বয় এই সকল কথাবার্তা কহিতেছিলেন, এমন সময়ে কোমলকণ্ঠনিঃসৃত মধুর সঙ্গীত তাঁহাদিগের কর্ণ-রন্ধ্রে প্রবেশ করিল ।

“মথুরাবাসিনি, মধুরহাসিনি,
শ্রামবিলাসিনী—রে !”

মৃগালিনী কহিলেন, “সই, কোথায় গান করিতেছে ?”

মণিমালিনী কহিলেন, “বাহির বাড়ীতে গায়িতেছে ।”

গায়ক গায়িতে লাগিল ।

“কহ লো নাগরি, গেহ পরিহরি,
কাহে বিবাসিনী—রে ।”

মৃ । সখি ! কে গায়িতেছে জান ?

মণি । কোন ভিখারিণী হইবে ।

জ্ঞাবার গীত ।

“কন্দাবনধন, গোপিনীমোহন,
কাহে তু তেয়াগী—রে ;
দেশ দেশ পর, সে শ্রামসুন্দর,
কিরে তুরা লাগি—রে ।”

মৃগালিনী বেগের সহিত কহিলেন, “সই! সই!
উহাকে বাটীর ভিতর ডাকিয়া আন।”

মণিমালিনী গায়িকাকে ডাকিতে গেলেন। ততক্ষণ
সে গায়িতে লাগিল।

“বিকচ নলিনে, যমুনা-পুলিনে,
 বহুত পিরামা—রে।
চন্দ্রমাশালিনি, যা মধুমামিনী,
 না মিটিল আশা—রে।”
 সা নিশা—সমরি—”

এমন সময়ে মণিমালিনী উহাকে ডাকিয়া বাটীর
ভিতর আনিলেন।

সে অন্তঃপুরে আসিয়া পূর্ববৎ গায়িতে লাগিল।

“সা নিশা সমরি, কহ লো স্মরনি,
 কাহা মিলে দেখা—রে।
 শুনি যাওয়ে চলি, বাজয়ি মুরলী,
 বনে বনে একা—রে।”

মৃগালিনী তাহাকে কহিলেন, “তোমার দিব্য গলা,
তুমি গীতটী আবার গাও।”

গায়িকার বয়স ষোল বৎসর। বোড়নী, খর্কাহুতা
এবং কুকাঙ্গী। সে প্রকৃত কৃষ্ণবর্ণা। তাই বলিয়া তাহার

গায়ে ভ্রমর বসিলে যে দেখা যাইত না, অথবা কালি মাথিলে জল মাথিরাছে বোধ হইত, কিংবা জল মাথিলে কালি বোধ হইত, এমন নহে । যেরূপ কৃষ্ণবর্ণ আগনার ঘবে থাকিলে শ্রামবর্ণ বলি, পরের ঘরে হইলে পাতুরে কালো বলি, ইহার সেইরূপ কৃষ্ণবর্ণ । কিন্তু বর্ণ যেমন হটক না কেন, ভিখারিণী কুরূপা নহে । তাহার অঙ্গ পরিষ্কার সুমার্জিত, চাকচিক্যবিশিষ্ট ; মুখখানি প্রফুল্ল, চক্ষু দুটা বড় চঞ্চল, হাস্যময় ; লোচনতারা নিবিড়কৃষ্ণ, একটা তারার পার্শ্বে একটা তিল । ওষ্ঠাধর ক্ষুদ্র, রক্তপ্রসৃত, তদন্তরে অতি পরিষ্কার অমলশ্বেত, কুন্দকলিকাসন্নিভ হই শ্রেণী দন্ত । কেশগুলি সূক্ষ্ম, গ্রীবার উপরে মোহিনী কবরা, তাহাতে যুথিকার মালা বেষ্টিত । ঘোবনসঞ্চারে শরীরের গঠন সুন্দর ইহঁদা ছিল, যেন কৃষ্ণপ্রস্বরে কোন শিল্পকার পুত্তল খোদিত করিয়াছিল । পরিচ্ছদ অতি সামান্ত, কিন্তু পরিষ্কার—ধূলিকর্দমপরিপূর্ণ নহে । অঙ্গ একেবারে নিরাতরণ নহে, অথচ অলঙ্কারগুলি ভিখারীর যোগ্য বটে । প্রকোষ্ঠে পিত্তলের বলয় ; গলার কাষ্ঠের মালা, নাসিকার ক্ষুদ্র একটা তিলক, ক্রমধ্যে ক্ষুদ্র একটা চন্দনের টিপ । সে আজ্ঞামত পূর্ববৎ গারিতে লাগিল ।

“মধুরাবাসিনি, মধুরহাসিনি, শ্যামবিলাসিনি—রে । *
 কহ লো নাগরি, গেহ পরিহরি, কাহে বিবাসিনি—রে ।
 বৃন্দাবনধন, গোপিনীমোহন, কাহে তু তেয়গী—রে ।
 দেশ দেশ পর, সো শ্যামসুন্দর, ফিরে তুয়া লাগি—রে ॥
 বিকচ নলিনে, যমুনাপুলিনে, বহত পিয়াসা—রে ।
 চন্দ্রমাশালিনী, যা মধুযামিনী, না মিটল আশা—রে ।
 সা নিশা সমরি, কহ লো সুন্দরি, কাহা মিলে দেখা—রে ।
 শুনি, যাওয়ে চলি, বাজয়ি মুরলী, বনে বনে একা—রে ॥”

গীত সমাপ্ত হইলে মৃগালিনী কহিলেন “তুমি সুন্দর
 গাও । সেই মণিমালিনি, ইহাকে কিছু দিলে ভাল হয় ।
 একে কিছু দাও না ?”

মণিমালিনী পুরস্কার আনিতে গেলেন, ইত্যবসরে
 মৃগালিনী বালিকাকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

“তু, তিখারিনি ! তোমার নাম কি ?

তিখা । আমার নাম গিরিজায়া ।

মৃগা । তোমার বাড়ী কোথায় ?

গি । এই নগরেই থাকি ।

মৃ । তুমি কি গীত গাইয়া দিনপাত কর ?

গি । আর কিছুই ত জানি না ।

মৃ । তুমি গীত সকল কোথায় পাও ?

* এই গীত চিমে তেতাল্লা তাল যোগে অরুণমতী রাগিনীতে গের ।

গি। যেখানে যা পাই। তাই শিখি।

• য়। এ গীতটী কোথায় শিখিলে ?

গি। একটা বেণে আমাকে শিখাইয়াছে।

য়। সে বেণে কোথায় থাকে ?

গি। এই নগরেই থাকে।

মৃগালিনীর মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল—প্রাতঃসূর্য্যকরম্পর্শে
যেন পদ্য ফুটিয়া উঠিল। কহিলেন;

“বেণেতে বাণিজ্য করে—সে বণিক কিসের বাণিজ্য
করে ?”

গি। সবার যে ব্যবসা তারও সেই ব্যবসা।

য়। সে কিসের ব্যবসা ?

গি। কথার ব্যবসা।

য়। এ নূতন ব্যবসা বটে। তাহাতে ~~স্বাভাবিক~~
কিরূপ ?

গি। ইহাতে লাভের অংশ ভালবাসা, অন্যত
কোমল।

য়। তুমিও ব্যবসায়ী বট। ইহার মহাজন কে ?

গি। যে মহাজন।

য়। তুমি ইহার কি ?

গি। নগ্না যুটে।

যু। ভাল তোমার বোকা নামাও । সামগ্রী কি আছে দেখি ।

গি। এ সামগ্রী দেখে না, শুনে ।

যু। ভাল—শুনি ।

গিরিজায়া গায়িতে লাগিল ।

“যমুনার জলে মোর, কি নিধি মিলিল ।
 ঝাপ দিয়া পশি জলে, যতনে তুলিয়া গলে,
 পরেছিনু কুতূহলে, যে রতনে ।
 নিজার আবেশে মোর, গৃহেতে পশিল চোর,
 কঠোর কাটিল ডোর, মণি হরে নিল ।”

যুগালিনী, বাষ্পপীড়িতলোচনে, গদগদস্বরে, অথচ হাসিয়া কহিলেন, “এ কোন্ চোরের কথা ?”

গি। বেণে বলেছেন, চুরির ধন লইয়াই তাঁহার ব্যাপার ।

যু। তাঁহাকে বলিও যে, চোরা ব্যাপারে সাধু লোকের প্রশংসা বাঁচে না ।

গি। বুঝি ব্যাপারিরও নয় ।

যু। কেন, ব্যাপারিরু কি ?

গিরিজায়া গায়িল ।

“ঘাট বাট ভট মাঠ কিরি কিরনু বহু দেশ ।
কাঁহা মেরে কাস্ত বরণ, কাঁহা রাজবেশ ।
হিয়া পর রোগনু পঙ্কজ, কৈনু যতন ভারি ।
সহি পঙ্কজ কাঁহা মোর, কাঁহা মুগাল হামারি ।”

মৃগালিনী, সস্নেহে কোমল স্বরে কহিলেন, “মুগাল
কোথায় ? আমি সন্ধান বলিয়া দিতে পারি, তাহা মনে
বাখিতে পারিবে ?”

গি। পারিব—কোথায় বল ।

মৃগালিনী বলিলেন,

“কণ্টকে গঠিল বিধি, মুগাল অধমে ।
জলে তারে ডুবাইল পীড়িয়া মরমে ॥
বাজহংস দেখি এক নয়নরঞ্জন ।
চরণ বেড়িয়া তারে, করিল বন্ধন ॥
বলে হংসরাজ কোথা করিবে গমন ।
হৃদয়কমলে গৌর, তোমার আসন ॥
আসিয়া বসিল হংস হৃদয়কমলে ।
কাপিল কণ্টক সহ মৃগালিনী জলে ॥
হেনকালে কাল মেঘ উঠিল আকাশে ।
উড়িল মরালরাজ, মানস বিলাসে ॥
ভাঁকিল হৃদয়পদ্ম তার বেগভরে ।
ডুবিয়া অতল জলে, মৃগালিনী মরে ॥

কেমন গিরিজায়া গীত শিখিতে পারিবে ?”

গিরি। তা পারিব । শুকের জলটুকু শুদ্ধ কি

শিখিব ?

মৃ। না। এ ব্যবসায়ের আমার লাভের মধ্যে
ঐটুকু ।

মৃগালিনী গিরিজায়াকে এই কবিতাগুলি অভ্যাস
করাইতেছিলেন, এমন সময়ে মণিমালিনীর পদধ্বনি
শুনিতো পাইলেন। মণিমালিনী তাঁহার স্নেহশালিনী
সখী—সকলই জানিয়াছিলেন। তথাপি মণিমালিনী
পিতৃপ্রতিজ্ঞাভঙ্গের সহায়তা করিবে, এরূপ তাঁহার বিশ্বাস
জন্মিল না। অতএব তিনি এ সকল কথা সখীর নিকট
গোপনে ষড়্ভবতী হইয়া গিরিজায়াকে কহিলেন, “আজি
আর কাজ নাই; বেণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। তোমার
বোঝা কাল আবার আনিও। যদি কিনিবার কোন
সামগ্রী থাকে, তবে তাহা আনি, কিনিব।”

গিরিজায়া বিদায় হইল। মৃগালিনী যে তাহাকে
পারিতোষিক দিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন, তাহা
ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

গিরিজায়া কতিপয় পদ গমন করিলে মণিমালিনী
কিছু চাউল, একছড়া কলা, একখানি পুরাতন বস্ত্র,
আর কিছু কড়ি আনিয়া গিরিজায়াকে দিলেন। আর
মৃগালিনীও একখানি পুরাতন বস্ত্র দিতে গেলেন। দিবার
সময়ে উহার কাণে কাণে কহিলেন, “আমার ধৈর্য্য

হইতেছে না, কালি পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিব না, তুমি আজ রাতে প্রহরেকের সময় আসিয়া এই গৃহের উত্তর দিকে প্রাচীরমূলে অবস্থিত করিও ; তথায় আমার সাফল্য পাইবে। তোমার বন্ধি যদি আসেন, সঙ্গে আনিও।”

গিরিজায়া কহিল, “বুঝিয়াছি, আমি নিশ্চিত আসিব।”

মৃগালিনী মণিমালিনীর নিকট প্রত্যাগতা হইলে মণিমালিনী কহিলেন, “সই, ভিখারিণীকে কাণে কাণে কি বালতত্ছিলে ?”

মৃগালিনী কহিলেন,

“কি বালদ সই—

সই মনের কথা সই, সই মনের কথা সই—

কাণে কাণে কি কথাটি ব'লে দিলি ওই ॥

সই কি ক'না সই, সই ফিরে ক'না সই ।

সই কথা কোস কথা কব, নইলে কারো নই ॥”

মণিমালিনী হাসিয়া কহিলেন,

“হ'লি কি লো সই ?”

মৃগালিনী কহিলেন,

“তোমারই সই।”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

দৃতী ।

লক্ষণাবতী নগরীর প্রদেশান্তরে সর্বদন বণিকের বাটীতে হেমচন্দ্র অবস্থিতি করিতেছিলেন । বণিকের গৃহদ্বারে এক অশোকবৃক্ষ বিরাজ করিতেছিল ; অপরাঙ্কে তাহাব তলে উপবেশন করিয়া, একটি কুম্মিত অশোক-শাখা নিম্প্রয়োজনে হেমচন্দ্র ছুরিকা দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিতে ছিলেন, এবং মুহূর্হঃ পথ প্রতি দৃষ্টি করিতেছিলেন, যেন কাহারও প্রতীক্ষা করিতেছেন । যাহার প্রতীক্ষা করিতে-ছিলেন, সে আসিল না । ভৃত্য, দিগ্বিজয় আসিল, হেম চন্দ্র দিগ্বিজয়কে কহিলেন,

“দিগ্বিজয়, শুগালিনী আজি এখনও আসিল না । আমি বড় বাস্ত হইলাম । তুমি একবার তাহার সন্ধানে যাও ।”

“যে আজ্ঞা” বলি- দিগ্বিজয় গিরিজার সন্ধানে চলিল । নগরীর রাজা : : গিরিজার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল ।

গিরিজায়া বলিল, “কেও দিগ্বিজয় ?” দিগ্বিজয় রাগ করিয়া কহিল, “আমার নাম দিগ্বিজয় ।”

গি । ভাল দিগ্বিজয়—আজি কোন্ দিক্ জয় করিতে চলিয়াছ ?

দি । তোমার দিক্ ।

গি । আমি কি একটা দিক্ ? তোর দিগ্বিদিক্ জ্ঞান নাই ।

দি । কেমন করিয়া থাকিবে—তুমি যে অন্ধকার । এখন চল, প্রভু তোমাকে ডাকিয়াছেন ।

গি । কেন ?

দি । তোমার সঙ্গে বৃষ্টি আমার বিবাহ দিবেন ।

গি । কেন তোমার কি মুখ-অগ্নি করিবার আর লোক জুটিল না ।

দি । না সে কাজ তোমাকেই করিতে হইবে । এখন চল ।

গি । পরের জন্মই মলেম । তবে চল ।

এই বলিয়া গিরিজায়া দিগ্বিজয়ের সঙ্গে চলিলেন । দিগ্বিজয়, অশোকতলস্থ হেমচন্দ্রকে দেখাইয়া দিয়া অন্তত গমন করিল । হেমচন্দ্র অন্তমনে মৃদু মৃদু গাইতেছিলেন,

“বিকচ নলিনে, যমুনা-পুলিনে, বহুত পিয়াসা—রে”

গিরিজায়া পশ্চাৎ হইতে গায়িল,

“চন্দ্রমাশালিনী, যা মধুযামিনী, না মিটল আশা—য়ে”

গিরিজায়াকে দেখিয়া হেমচন্দ্রের মুখ প্রকুল হইল ।
কহিলেন,

“কে গিরিজায়া ! আশা কি মিটল ?”

গি । কার আশা ? আপনার না আমার ?
হে । আমার আশা । তাহা হইলেই তোমার
মিটিবে ।

গি । আপনার আশা কি প্রকারে মিটিবে ? লোকে
বলে রাজা রাজ্‌ড়ার আশা কিছুতেই মিটে না ।

হে । আমার অতি সামান্য আশা ।

গি । যদি কখন মৃগালিনীর সাক্ষাৎ পাই, তবে এ
কথা তাঁহার নিকট বলিব ।

হেমচন্দ্র বিষম হইলেন । কহিলেন, “তবে কি আজিও
মৃগালিনীর সন্ধান পাও নাই ? আজি কোন্ পাড়ায় গীত
গাইতে গিয়াছিলে ?”

গি । অনেক পাড়ায়—সে পরিচয় আপনার নিকট
নিত্য নিত্য কি দিব ? অন্য কথা বলুন ।

হেমচন্দ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, “বুঝিলাম
বিধাতা বিমুখ । ভাল পুনর্বার কালি সন্ধানে যাইবে ।”

গিরিজায়া তখন প্রণাম করিয়া কপট বিদায়ের উদ্যোগ করিল । গমনকালে হেমচন্দ্র তাহাকে কহিলেন, “গিরিজায়া, তুমি হাসিতেছ না, কিন্তু তোমার চক্ষু হাসিতেছে । আজি কি তোমার গান শুনিয়া কেহ কিছু বলিয়াছে ?”

গি । কে কি বলিবে ? এক মাগী তাড়া করিয়া মারিতে আসিয়াছিল—বলে মথুরাবাসিনীর জন্তে শ্রাম-সুন্দরের তু মাথাবাথা পড়িয়াছে ।

হেমচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অক্ষুটস্বরে যেন আপনা আপনি কহিতে লাগিলেন, “এত বড়েও যদি সন্ধান না পাইলাম, তবে আর বৃথা আশা—কেন মিছা কালক্ষেপ করিয়া আত্মকন্ম নষ্ট করি ;—গিরিজায়া, কালি তোমাদের নগর হইতে বিদায় হইব ।”

“তথাস্তু” বলিয়া গিরিজায়া মৃদু মৃদু গান করিতে লাগিল,—

“শুনি যাওয়ে চলি, বাজরি মুরলী, বনে বনে একা—রে ।”

হেমচন্দ্র কহিলেন, “ও গান এই পর্যাস্তু । অন্য গীত গাও ।”

গিরিজায়া গাইল,

“যে ফুল ফুটিত সখি, গৃহতরুশাখে,
কেন বে পবনা, উড়ালি তাকে ।”

হেমচন্দ্র কহিলেন, “পবনে যে ফুল উড়ে, তাহার জন্ম
হুঃখ কি ? ভাল গীত গাও ।”

গিরিজারা গায়িল,

“কণ্টকে গঠিল বিধি, মৃগাল অধমে ।
জলে তারে ডুবাইল পীড়িয়া মরমে ।”

হেম । কি, কি ? মৃগাল কি ?

গি । কণ্টকে গঠিল বিধি, মৃগাল অধমে ।
জলে তারে ডুবাইল, পীড়িয়া মরমে ।
রাজহংস দেখি এক নয়নরঞ্জন ।
চরণ বেড়িয়া তারে করিল বন্ধন ॥

না—অন্য গান গাই ।

হে । না—না—না—এই গান—এই গান গাও
ভূমি রাক্ষসী :

গি । বলে হংসরাজ কোথা করিবে গমন ।
হৃদয়কমলে দিব তোমার আসন ॥
আসিয়া বসিল হংস হৃদয়কমলে ।
কাঁপিল কণ্টক সহ মৃগালিনী জলে ॥

হে । গিরিজারা ! গিরি—এ গীত তোমাকে কে
নিখাইল ?

গি । (সহাস্ত্রে)

হেন কালে কালনেঘ উঠিল আকাশে ।
উড়িল মরালরাজ মানস বিলাসে ।
ভাঙিল হৃদয়পদ্ম তার বেগভরে ।
দুবিয়া অতলজলে মৃগালিনী যবে । ৯

হেমচন্দ্র বাষ্পাকুললোচনে গদ্যদ্বয়ে গিরিজায়াকে
কহিলেন, “এ আমারই মৃগালিনী । • তুমি তাহাকে
কোথায় দেখিলে ?”

গি । প্রিয়স্বামী মরালরাজে কপিতে পবনভবে
হৃদয় উপরে মৃগালিনী ।

হে । এখন রূপক রাক্ষ, আমার কথাই উত্তর দাও—
কোথায় মৃগালিনী ?

গি । এই নগরে ।

হেমচন্দ্র কষ্টভাবে কহিলেন, “তা ত আমি অনেক
দিন জানি । এ নগরে কোন্ স্থানে ?”

গি । স্বৰীকেশ শর্ম্মার বাড়ী ।

হে । কি পাপ ! সে কথা আমিই তোমাকে বলিয়া
দিয়াছিলাম । এত দিন ত তাহার সন্ধান করিতে পার
নাই, এখন কি সন্ধান করিয়াছ ?

গি । সন্ধান করিয়াছি ।

হেমচন্দ্র দুই বিন্দু—দুই বিন্দু মাত্র অশ্রুমোচন করিলেন । পুনরপি কহিলেন, “সে এখান হইতে কত দূর ?”

গি : অনেক দূর ।

হে । এখান হইতে কোন দিকে যাইতে হয় ?

গি । এখান হইতে দক্ষিণ, তার পব পূর্ব, তার পব উত্তর, তার পব পশ্চিম—

হেমচন্দ্র হস্ত মৃষ্টিবদ্ধ করিলেন ; কহিলেন, “এ সময়ে তামাসা রাখ—নহিলে মাথা ভাঙ্গিয়া ফেলিব ।”

গি । শান্ত হউন : পথ বলিয়া দিলে কি আপনি চিন্তিতে পারিবেন : যদি তা না পারিবেন, তবে জিজ্ঞাসার প্রয়োজন ? আজ্ঞা করিলে আমি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব ।

মেঘমুক্ত সূর্যের জ্বাল হেমচন্দ্রের মুখ প্রফুল্ল হইল । তিনি কহিলেন,

“তোমার সর্বকামনা সিদ্ধ হউক—মৃগালিনী কি বলিল ?”

গি । তা ত বলিয়াছি ।—

“ডুবিয়া অতল-জলে মৃগালিনী মরে ।”

হে । মৃগালিনী কেমন আছে ?

গি । দেখিলাম শরীরে কোন গীড়া নাই ।

হে । সুখে আছে কি ক্লেশে আছে—কি বুঝিলে ?

গি । শরীরে গহনা, পরণে ভাল কাপড়—হৃষীকেশ
ব্রাহ্মণের কণ্ঠার সহি ।

হে । তুমি অধঃপাতে যাও ; মনের কথা কিছু
বুঝিলে ?

গি । বর্ষাকালের পদ্মের মত : মুখখানি কেবল জলে
ভাসিতেছে ।

হে । পরগৃহে কি ভাবে আছে ?

গি । এই অশোক ফুলের স্তবকের মত । আপনার
গৌরবে আপনি নম্র ।

হে । গিরিজায়া ! তুমি বয়সে বালিকা মাত্র ।
তোমার গায় বালিকা আর দেখি নাই ।

গি । মাথা ভাঙ্গিবার উপযুক্ত পাত্রও এমন আর
দেখেন নাই ।

হে । সে অপরাধ লইও না । মৃগালিনী আর কি
বলিল ?

গি । যো দিন জানকী—

হে । আবার ?

গি । যো দিন জানকী, রঘুবীর নিরখি—

• হেমচন্দ্র গিরিজায়ার কেশাকর্ষণ করিলেন। তখন সে কহিল, “ছাড় ! ছাড় ! বলি ! বলি !”

“বল” বলিয়া হেমচন্দ্র কেশ ত্যাগ করিলেন।

তখন গিরিজায়া আদ্যোপান্ত মৃগালিনীর সহিত কথোপকথন বিবৃত করিল। পরে কহিল,

“মহাশয় ! আপনি যদি মৃগালিনীকে দেখিতে চান, তবে আমার সঙ্গে এক প্রহর রাতে যাত্রা করিবেন।”

গিরিজায়ার কথা সমাপ্ত হইলে, হেমচন্দ্র অনেকক্ষণ নিঃশব্দে অশোকতলে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে কিছুমাত্র না বলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এবং তথা হইতে একখানি পত্র আনিয়া গিরিজায়ার হস্তে দিলেন, এবং কহিলেন,

“মৃগালিনীর সহিত সাক্ষাতে আমার এক্ষণে অধিকার নাই। তুমি রাতে কথামত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে এবং এই পত্র তাঁহাকে দিবে। কহিবে, দেখত! প্রসন্ন হইলে অবশ্য শীঘ্র বৎসরেক মধ্যে সাক্ষাৎ হইবে। মৃগালিনী কি বলেন, আজ রাতেই আমাকে বলিয়া যাইও।”

গিরিজায়া বিদায় হইলে, হেমচন্দ্র অনেকক্ষণ চিন্তিতাস্তঃ-
করণে অশোকবৃক্ষতলে তৃণশয্যা শয়ন করিয়া রহিলেন।

ভূজোপরি মস্তক রক্ষা করিয়া, পৃথিবীর দিকে মুখ রাখিয়া, শয়ান রহিলেন । কিয়ৎকাল পরে, সহসা তাঁহার পৃষ্ঠদেশে কঠিন কবরুপন হইল । মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, সম্মুখে মাধবাচার্য্য ।

মাধবাচার্য্য কহিলেন, “বৎস ! গাত্রোত্থান কেন । আমি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছি—সন্তুষ্টও হইয়াছি । তুমি আমাকে দেখিয়া বিস্মিতের স্থায় কেন চাহিয়া রহিয়াছ ?”

হেমচন্দ্র কহিলেন, “আপনি এখানে কোথা হইতে আসিলেন ?”

মাধবাচার্য্য এ কথায় কোন উত্তর না দিয়া কহিতে লাগলেন,

“তুমি এ পর্য্যন্ত নবদ্বীপে না গিয়া পথে বিলম্ব করিতেছ—ইহাতে তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছি । আর তুমি যে মৃগালিনীর সন্ধান পাইয়াও অস্বস্ততা প্রতিপালনের জ্ঞান তাহার সাক্ষাতের সুযোগ উপেক্ষা করিলে, এজন্য তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি । তোমাকে কোন ভিন্নকার্য্য কবিব না । কিন্তু এখানে তোমার আর বিলম্ব করা হইবে না । মৃগালিনীর প্রত্যাহ্বের প্রার্থনা করা হইবে না । বেগবান্ হৃদয়কে বিশ্বাস নাই । আমি

আজি নবদীপে যাত্রা করিব । তোমাকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে—নৌকা প্রস্তুত আছে । অস্ত্র শস্ত্রাদি গৃহমধ্য হইতে লইয়া আইস । আমার সঙ্গে চল ।”

হেমচন্দ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন । “হানি নাই—আমি আশা ভরসা বিসর্জন করিয়াছি । চলুন । কিন্তু আপনি—কামচর না অন্তর্যামী ?”

এই বলিয়া হেমচন্দ্র গৃহমধ্যে পুনঃপ্রবেশ পূর্বক বণিকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন । এবং আপনার সম্পত্তি একজন বাহকের স্বন্ধে দিয়া আচার্যের অন্তবস্ত্রী হইলেন ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

লুক ।

মৃগালিনী বা গিরিজায়া এতন্মধ্যে কেহই আশ্বপ্রতিশ্রুতি বিস্মৃতা হইলেন না । উভয়ে প্রহরেক রাত্রিতে হৃষীকেশের গৃহপার্শ্বে সম্মিলিত হইলেন । মৃগালিনী গিরিজায়াকে দেখিবামাত্র কহিলেন,



“কই, হেমচন্দ্র কোথায় ?”

• গিরিজায়া কহিল “তিনি আইসেন নাই ।”

“আইসেন নাই !” এই কথাটী মৃগালিনীর অন্তস্তল হইতে ধ্বনিত হইল : ক্ষণেক উভয়ে নীরব । তৎপর মৃগালিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন আসিলেন না ?”

গি । তাহা আমি জানি না । এই পত্র দিয়াছেন ।

এই বলিয়া গিরিজায়া তাঁহার হস্তে পত্র দিল । মৃগালিনী কহিলেন, “কি প্রকারেই বা পড়ি । গৃহে গিয়া প্রদীপ জালিয়া পড়িলে মৃগালিনী উঠিবে ।”

গিরিজায়া কহিল, “অধীরা হইও না । আমি প্রদীপ, তেল, চক্কমকি, সোলা সকলই আনিয়া রাখিয়াছি । এখনই আলো করিতেছি ”

গিরিজায়া শীঘ্রহস্তে অগ্নি উৎপাদন করিয়া প্রদীপ জালিত করিল । অগ্ন্যুৎপাদনশক একজন গৃহবাসীর কর্ণে প্রবেশ করিল—দীপালোক সে দেখিতে পাইল ।

গিরিজায়া দীপ জালিত করিলে মৃগালিনী নিম্নলিখিত মত মনে মনে পাঠ করিলেন ।

“মৃগালিনী ! কি বলিয়া আমি তোমাকে পত্র লিখিব ? তুমি আমার জন্ম দেশত্যাগিনী হইয়া পরগৃহে কষ্টে কালাতিপাত করিতেছ । যদি দৈবানুগ্রহে তোমার

সন্ধান পাইয়াছি, তথাপি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করি-
লাম না। তুমি ইহাতে আমাকে অপ্রণয়ী মনে করিবে—
অথবা অশ্রী হইলে মনে করিত—তুমি করিবে না।
আমি কোন বিশেষ ব্রতে নিযুক্ত আছি—যদি তৎপ্রতি
অবহেলা করি, তবে আমি কুলাঙ্গার। তৎসাধন জগু
আমি গুরুর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি যে, তোমার
সহিত এ স্থানে সাক্ষাৎ করিব না। আমি নিশ্চিত জানি
যে, আমি যে তোমার জগু সত্যভঙ্গ করিব, তোমারও
এমন সাধ নহে। অতএব এক বৎসর কোন ক্রমে দিন
যাপন কর। পরে ঈশ্বর প্রসন্ন হইলে, তবে অচিরাৎ
তোমাকে রাজপুরবধু করিয়া আশ্বস্থ সম্পূর্ণ করিব।
এই অন্নবয়স্কা প্রগল্ভবুদ্ধি বালিকাহস্তে উত্তর খেরণ
করিও।” মৃগালিনী পত্র পড়িয়া গিরিজায়াকে কহিলেন,

“গিরিজায়া! আমার পাতা লেখনী কিছুই নাই যে
উত্তর লিখি। তুমি মুখে আমার প্রত্যুত্তর লইয়া যাও।
তুমি বিশ্বাসী, পুরস্কার স্বরূপ আমার অঙ্গের অলঙ্কার
দিতেছি।”

গিরিজায়া কহিল, “উত্তর কাহার নিকট লইয়া
যাইব? তিনি আমাকে পত্র দিয়া বিদায় করিবার সময়
বলিয়া দিয়াছিলেন যে, “আজ রাতেই আমাকে প্রত্যুত্তর

আনিয়া দিও।” আমিও স্বীকার করিয়াছিলাম। আসি-
বার সময় মনে করিলাম, হয় ত তোমার নিকট লিখিবার
সামগ্রী কিছুই নাই; এজন্য সে সকল যোটপাট করিয়া
আনিবার জন্য তাঁহার উদ্দেশে গেলাম। তাঁহার
সাক্ষাৎ পাইলাম না, শুনিলাম তিনি সন্ধ্যাকালে নবদ্বীপ
যাত্রা করিয়াছেন।”

মৃ। নবদ্বীপ ?

গি। নবদ্বীপ।

মৃ। সন্ধ্যাকালেই ?

গি। সন্ধ্যাকালেই। শুনিলাম তাঁহার গুরু আসিয়া
তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন।

মৃ। মাধবাচার্য্য ! মাধবাচার্য্যই আমার কাল।

পরে অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া মৃগালিনী কহিলেন,
“গিরিজায়া, তুমি বিদায় হও। আর আমি ঘরের বাহিরে
থাকিব না।”

গিরিজায়া কহিল, “আমি চলিলাম।” এই বলিয়া
গিরিজায়া বিদায় হইল। তাহার মৃদু মৃদু গীতধ্বনি
শুনিতে শুনিতে মৃগালিনী গৃহ মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন।

মৃগালিনী বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া যেমন দ্বার রুদ্ধ
করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, অমনি পশ্চাৎ হইতে

কে আসিয়া তাঁহার হাত ধরিল। মৃগালিনী চমকিয়া উঠিলেন। হস্তরোধকারী কহিল,

“তবে সাধিব ! এইবার জালে পড়িয়াছ। অনুগৃহীত ব্যক্তিটা কে শুনিতে পাই না ?”

মৃগালিনী তখন ক্রোধে কম্পিতা হইয়া কহিলেন,
“ব্যোমকেশ ! ব্রাহ্মণকূলে পাষণ্ড ! হাত ছাড়।”

ব্যোমকেশ ঈষীকেশের পুত্র। এ ব্যক্তি ঘোর মূর্থ এবং দুঃচারিত্র। সে মৃগালিনীর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়াছিল, এবং স্বাভিলাষ পূরণের অণু কোন সম্ভাবনা নাই জানিয়া বলপ্রকাশে ক্লতসঙ্কল্প হইয়াছিল। কিন্তু মৃগালিনী মণিমালিনীর সঙ্গ প্রায় ত্যাগ করিতেন না, এ অণু ব্যোমকেশ এ পর্য্যন্ত অবসর প্রাপ্ত হয় নাই।

মৃগালিনীর ভৎসনায় ব্যোমকেশ কহিল, “কেন হাত ছাড়িব ? হাতছাড়া কি কর্তে আছে ? ছাড়াছাড়িতে কাজ কি, ভাই ? একটা মনের দুঃখ বলি, আমি কি মনুষ্য নই ? যদি একের মনোরঞ্জন করিয়াছ, তবে অপরের পার না ?”

মৃ। কুলান্দার ! যদি না ছাড়িবে, তবে এখনই ডাকিয়া গৃহস্থ সকলকে উঠাইব।

ব্যো। উঠাও। আমি কহিব অভিসারিকাকে ধরিয়াছি।

মৃ। তবে অধঃপাতে যাও। এই বলিয়া মৃগালিনী সবলে হস্তমোচন জ্ঞাত চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকায্য হইতে পারিলেন না। ব্যোমকেশ কহিল, “অধীর হইও না। আমার মনোরথ পূর্ণ হইলেই আমি তোমায় ত্যাগ করিব। এখন তোমার সেই, ভগিনী মণিমালিনী কোথায়?”

মৃ। আমিই তোমার ভগিনী।

ব্যো। তুমি আমার সম্বন্ধীর . ভগিনী—আমার ব্রাহ্মণীর ভেয়ের ভগিনী—আমার প্রাণাধিকা রাধিকা! সর্বার্থসাধিকা!

এই বলিয়া ব্যোমকেশ মৃগালিনীকে হস্তদ্বারা আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিল। যখন মাধবাচার্য্য তাঁহাকে হরণ করিয়াছিল, তখন মৃগালিনী স্ত্রীস্বভাবসুলভ চীৎকারে রতি দেখান নাই, এখনও লক্ষ করিলেন না।

কিন্তু মৃগালিনী আরও সহ্য করিতে পারিলেন না। মনে মনে লক্ষ ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া সবলে ব্যোমকেশকে পদাঘাত করিলেন। ব্যোমকেশ লাথি খাইয়া বলিল,

“ভাল ভাল, ধন্য হইলাম! ও চরণস্পর্শে মোক্ষপদ পাইব। সুন্দরি! তুমি আমার দ্রৌপদী—আমি তোমার জয়দ্রথ!”

পশ্চাৎ হইতে কে বলিল, “আর আমি তোমার
মার্জন ।”

অকস্মাৎ ব্যোমকেশ কাতরস্বরে বিকট চীৎকার
করিয়া উঠিল। “রাক্ষসি! তোর দন্তে কি বিষ আছে?”
এই বলিয়া ব্যোমকেশ মৃগালিনীর হস্ত ত্যাগ করিয়া
আপন পৃষ্ঠে হস্তমার্জন করিতে লাগিল। স্পর্শানুভবে
জানিল যে পৃষ্ঠ দিয়া দরদরিত রুধির পড়িতেছে।

মৃগালিনী মুক্তহস্তা হইয়াও পলাইলেন না। তিনিও
প্রথমে ব্যোমকেশের গায় বিস্মিতা হইয়াছিলেন, কেন
না, তিনি ত ব্যোমকেশকে দংশন করেন নাই। ভল্লুকো-
চিত্ত কার্য্য তাঁহার করণীয় নহে; কিন্তু তখনই
নক্ষত্রালোকে খৰ্ব্বাকৃতি বালিকামূর্ত্তি সম্মুখ হইতে অপ-
সৃত্তা হইতে দেখিতে পাইলেন। গিরিজায়া তাঁহার
বসনাকর্ষণ করিয়া মৃদুস্বরে, “পলাইয়া আইস” বলিয়া
স্বয়ং পলায়ন করিল।

পলায়ন মৃগালিনীর স্বভাবসঙ্গত নহে। তিনি পলায়ন
করিলেন না। ব্যোমকেশ প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আর্তনাদ
করিতেছে এবং কাতরোক্তি করিতেছে দেখিয়া, তিনি
গর্জ্জগমনে নিজ শয়নাগার অভিমুখে চলিলেন। কিন্তু
তৎকালে ব্যোমকেশের আর্তনাদে গৃহস্থ সকলেই

জাগৰিত হইয়াছিল । সম্মুখে স্বৰীকেশ । স্বৰীকেশ ,
পুলকে শশব্যস্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

“কি হইয়াছে ? কেন বাঁড়ের মত চীৎকার করি-
তেছ ?”

ব্যামকেশ কাহল, মৃগালিনী অভিসারে গমন
করিয়াছিল, আমি তাহাকে ধৃত করিয়াছি বলিয়া সে
আমার পৃষ্ঠে দারুণ দংশন করিয়াছে ।”

স্বৰীকেশ পুলের কুরীতি কিছুই জানিতেন না ।
মৃগালিনীকে প্রাঙ্গণ হইতে উঠিতে দেখিয়া এ কথায়
তাঁহার বিশ্বাস হইল । তৎকালে তিনি মৃগালিনীকে
কিছুই বলিলেন না । নিঃশব্দে গজগামিনীর পশ্চাৎ
তাঁহার শয়নাগারে আসিলেন ।

মৰ্ত্ত পরিচ্ছেদ ।

স্বৰীকেশ ।

মৃগালিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শয়নাগারে আসিয়া
স্বৰীকেশ কাহিলেন,

“মৃগালিনি ! তোমাব এ কি চরিত্র ?”

মৃ। আমার কি চরিত্র ?

ছ। তুমি কার মেয়ে, কি চরিত্র কিছুই জানি না, গুরুর অনুরোধে আমি তোমাকে গৃহে স্থান দিচ্ছি। তুমি আমার মেয়ে মৃগালিনীর সঙ্গে এক বিছানায় শোও—তোমার কুলটাবৃত্তি কেন ?

মৃ। আমার কুলটাবৃত্তি যে বলে সে মিথ্যাবাদী।

হৃদীকেশের ক্রোধে অধর কম্পিত হইল। কহিলেন, “কি পাণীয়সি ! আমার অন্তে উদর পূরাবি, আর আমাকে দুর্বাক্য বলিবি ? তুই আমার গৃহ হইতে দূর হ। না হয় মাধবাচার্য্য রাগ করিবেন, তা বলিয়া এমন কালসাপ ঘরে রাখিতে পারিব না।”

মৃ। যে আজ্ঞা—কালি প্রাতে আর আমাকে দেখিতে পাইবেন না।

হৃদীকেশের বোধ ছিল যে, যে কালে তাহার গৃহ-বহিষ্কৃত হইলেই মৃগালিনী আশ্রয়হীনা হয়, সেকালে এমন উত্তর তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। কিন্তু মৃগালিনী নিরাশ্রয়ের আশঙ্কায় কিছুমাত্র ভীতা নহেন দেখিয়া মনে করিলেন যে, তিনি জাগৃহে স্থান পাইবার ভয়সাতেই এরূপ উত্তর করিলেন। ইহাতে হৃদীকেশের কোপ আরও বৃদ্ধি হইল। তিনি অধিকতর বেগে কহিলেন,

“কালি প্রাতে ! আজই দূর হও ।”

মৃ। যে আজ্ঞা। আমি সখী মণিমালিনীর নিকট
বিদায় হইয়া আজই দূর হইতেছি ।

এই বলিয়া মৃণালিনী গালোথান করিলেন ।

হৃষীকেশ কহিলেন, “মণিমালিনীর সহিত কুলটার
আলাপ কি ?”

এবার মৃণালিনীর চক্ষে জল আসিল । কহিলেন.
“তাহাই হইবে । আমি কিছুই লইয়া আসি নাই ; কিছুই
লইয়া যাইব না । একবসনে চলিলাম । আপনাকে
প্রণাম হই ।”

এই বলিয়া দ্বিতীয় বাক্যব্যয় ব্যতীত মৃণালিনী
শয়নাগার হইতে বহিষ্কৃত হইয়া চলিলেন ।

যেমন অন্ত্যাত্ম গৃহবাসীরা ব্যোমকেশের আর্ন্তনাদে
শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়াছিলেন, মণিমালিনীও তদ্রূপ
উঠিয়াছিলেন । মৃণালিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পিতা
শয্যাগৃহ পর্য্যন্ত আসিলেন দেখিয়া, তিনি এই অবসরে
ব্রাতার সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন ; এবং ব্রাতার
হৃচ্ছরিত্র বুদ্ধিতে পারিয়া তাঁহাকে ভৎসনা করিতে-
ছিলেন । যখন তিনি ভৎসনা সমাপন করিয়া প্রত্যাগমন
করেন, তখন প্রাজ্ঞভূমে দ্রুতপাদবিক্ষেপিনী মৃণা-

লিনীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,

“সই, অমন করিয়া এত রাতে কোথায় যাইতেছ ?”

মৃগালিনী কহিলেন, “সখি, মণিমালিনি, তুমি চিরায়ুস্বতী হও। আমার সহিত আলাপ করিও না— তোমার বাপ মানা করেছেন।”

মণি। সে কি মৃগালিনি ! তুমি কাঁদিতেছ কেন ? সর্বনাশ ! বাবা কি বলিতে না জানি কি বলিয়াছেন ! সখি, ফের। রাগ করিও না।

মণিমালিনী মৃগালিনীকে ফিরাইতে পারিলেন না। পর্বতসানুবাহী শিলাখণ্ডের ত্রায় অভিমালিনী সাধ্বী চলিয়া গেলেন। তখন অতি ব্যস্তে মণিমালিনী পিতৃসন্নিধানে আসিলেন। মৃগালিনীও গৃহের বাহিরে আসিলেন।

বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, পূর্বসঙ্কেত স্থানে গিরি-জায়া দাঁড়াইয়া আছে। মৃগালিনী তাহাকে দেখিয়া কহিলেন,

“তুমি এখনও দাঁড়াইয়া কেন ?”

গি। আমি যে তোমাকে পলাইতে বলিয়া আসি-লাম। তুমি আইস না আইস—দেখিয়া যাইবার জন্য দাঁড়াইয়া আছি।

মৃ। তুমি কি ব্রাহ্মণকে দংশন করিয়াছিলে ?

গি। তা ক্ষতি কি ? বামুন বৈ ত গরু নয় ?

মৃ। কিন্তু তুমি যে, গান করিতে করিতে চলিয়া গেলে শুনিলাম ?

গি। তার পর তোমাদের কথাবার্তার শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখিতে আসিয়াছিলাম। দেখে মনে হলো, মিন্সে আমাকে একদিন “কালী পিপড়ে” বলে ঠাট্টা করেছিল। সে দিন হল ফুটানটা বাকি ছিল। স্নানোগ পেয়ে বামুনের ঋণ শোধ দিলাম। এখন তুমি কোথা যাইবে ?

মৃ। তোমার ঘর দ্বার আছে ?

গি। আছে। পাতার কুঁড়ে।

মৃ। সেখানে আর কে থাকে ?

গি। এক বুড়ী মাত্র। তাহাকে আয়ি বলি।

মৃ। চল, তোমার ঘরে যাব।

গি। চল। তাই ভাবিতেছিলাম।

এই বলিয়া দুইজনে চলিল। যাইতে যাইতে গিরিজারা কহিল, “কিন্তু সে ত কুঁড়ে। সেখানে কয় দিন থাকিবে ?”

মৃ। কালি প্রাতে অন্তত যাইব।

গি। কোথা? মথুরায়?

মৃ। মথুরায় আমার আর স্থান নাই।

গি। তবে কোথায়?

মৃ। যমালয়।

এই কথার পর দুই জনে ক্ষণেক কাল চুপ করিয়া
রহিল। তার পর মৃগালিনী বলিল, “এ কথা কি তোমার
বিশ্বাস হয়?”

গি। বিশ্বাস হইবে না কেন? কিন্তু সে স্থান ত
আছেই, যখন ইচ্ছা তখনই যাইতে পারিবে। এগুন
কেন আর এক স্থানে যাও না?

মৃ। কোথা?

গি। নবদ্বীপ।

মৃ। গিরিজায়া, তুমি তিথারিণী বেশে কোন মায়া-
বিনী। তোমার নিকট কোন কথা গোপন করিব না।
বিশেষ তুমি হিতৈষী। নবদ্বীপেই যাইব স্থির করিয়াছি।

গি। একা যাইবে?

মৃ। সঙ্গী কোথায় পাইব?

গি। (গায়িতে গায়িতে)

“মেঘ দরশনে হায়, চাতকিনী ধায় রে।

সঙ্গে যাবি কে কে তোরা আয় আয় আয় রে।

মেঘেতে বিজলি হাসি, আমি বড় ভাল বাসি.
যে যাবি সে যাবি তোরা, গিরিজায়্যে যাব রে ॥”

মুং : এ কি রহস্য, গিরিজায়্যে ?

গি। আমি যাব।

মুং : সত্য সত্যই ?

গি। সত্য সত্যই যাব।

মুং : কেন যাবে ?

গি। • আমার সর্বত্র সমান। বৃজধানীতে ভিক্ষা

বিস্তৃত



দ্বিতীয় খণ্ড ।



4

■



দ্বিতীয় খণ্ড ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

গোড়েশ্বর ।

অতি বিস্তীর্ণ সভামণ্ডপে নবদীপোজ্জলকারী রাজাধি-
রাজ গোড়েশ্বর বিরাজ করিতেছেন । উচ্চ শ্বেত
শ্রেণীর বেদির উপরে রত্নপ্রবালবিভূষিত সিংহাসনে,
রত্নপ্রবালমণ্ডিত ছত্রতলে বসীয়া রাজা বসিয়া আছেন ।
শিরোপরি কনককিঙ্কিণী-মংবেষ্টিত বিচিত্র কারুকার্য-
খচিত শুভ্র চক্রাতপ শোভা পাইতেছে । এক দিকে
পৃথগাসনে হোমাবশেষবিভূষিত, অনিন্দ্যমূর্তি ব্রাহ্মণ-

মণ্ডলী সভাপণ্ডিতকে পরিবেষ্টন করিয়া বসিয়া আছেন। যে আসনে, একদিন হ্রায়ুধ উপবেশন করিয়াছিলেন, সে আসনে এক্ষণে এক অপরিণামদর্শী চাটুকার অধিষ্ঠান করিতেছিলেন। অত্র দিকে মহামাতা ধর্ম্মাধিকারকে অগ্রবর্তী করিয়া প্রধান রাজপুরুষেরা উপবেশন করিয়াছিলেন। মহাসামন্ত, মহাকুমারামাতা, প্রমাতা, ঔপরিক, দাসাপরাধিক, চোরোদ্ধরণিক, শৌক্লিক, গৌল্লিকগণ, ক্যাত্রপ, প্রান্তপালেরা, কোষ্ঠপালেরা, কাণ্ডরিক্য, তদায়ুক্তক, বিনিয়ুক্তক প্রভৃতি সকলে উপবেশন করিতেছেন। মহাপ্রতীহার সশস্ত্রে সভার অসাধারণতা রক্ষা করিতেছেন। স্তাবকেরা উভয়পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সর্বজন হইতে পৃথগাসনে কুশাসনমাত্র গ্রহণ করিয়া পণ্ডিতবর মাধবাচার্য্য উপবেশন করিয়া আছেন।

রাজসভার নিয়মিত কার্য্য সকল সমাপ্ত হইলে, সভাভঙ্গের উদ্যোগ হইল। তখন মাধবাচার্য্য রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “মহারাজ ! ব্রাহ্মণের বাচালতা স্মার্ত্তনা করিবেন। আপনি রাজনীতিষিষারদ, এক্ষণে ভূমণ্ডলে যত রাজগণ আছেন সর্বাপেক্ষা বহুদর্শী ; প্রজাপালক ; আপনিই আজন্ম রাজা। আপনার অবিদিত নাই যে

শত্রুদমন রাজার প্রধান কর্ম্ম । আপনি প্রবল শত্রু
দমনের কি উপায় করিয়াছেন ?”

রাজা কহিলেন, “কি আজ্ঞা করিয়াছেন ?” সকল কথা
বর্ষায়ান্ রাজার শ্রুতিশ্রুত হয় নাই ।

মাধবাচার্যের পুনরুক্তির প্রতীক্ষা না করিয়া ধর্ম্মা-
ধিকার পশুপতি কহিলেন, “মহারাজাধিরাজ ! মাধবাচার্য
রাজসমীপে জিজ্ঞাসু হইয়াছেন যে, রাজশত্রুদমনের কি
উপায় হইয়াছে । বঙ্গেশ্বরের কোন্ শত্রু এ পর্য্যন্ত দমিত
হয় নাই, তাহা এখনও আচার্য ব্যক্ত করেন নাই । তিনি
সবিশেষ বাচন করুন ।”

মাধবাচার্য অল্প হাস্য করিয়া এবার অত্যুচ্চস্বরে
কহিলেন, “মহারাজ, তুরকীয়েরা আর্ধ্যাবর্ত্ত প্রায় সমুদয়
হস্তগত করিয়াছে । আপাততঃ তাহারা মগধ জয় করিয়া
গৌড়রাজ্য আক্রমণের উদ্যোগে আছে ।”

এবার কথা রাজার কর্ণে প্রবেশ লাভ করিল । তিনি
কহিলেন, “তুরকীদিগের কথা বলিতেছেন ? তুরকীয়েরা
কি আসিয়াছে ?”

মাধবাচার্য কহিলেন, “ঈশ্বর রক্ষা করিতেছেন ;
এখনও তাহারা এখানে আসে নাই । কিন্তু আসিলে
আপনি কি প্রকারে তাহাদিগের নিবারণ করিবেন ?”

রাজা কহিলেন, “আমি কি করিব—আমি কি করিব ? আমার এই প্রাচীন শরীর, আমার যুদ্ধের উদ্যোগ সম্ভবে না। আমার এক্ষণে গঙ্গালাভ হইলেই হয়। তুরকৌয়েরা আসে আশুক।”

এবস্থিত রাজবাক্য সমাপ্ত হইলে সভাস্থ সকলেই নীরব হইল। কেবল মহাসামন্তের কোষমধ্যস্থ অসি অকারণ ঈর্ষা বনংকার শব্দ করিল। অধিকাংশ শ্রোতৃবর্গের মুখে কোন ভাবই ব্যক্ত হইল না। মাধবাচার্যের চক্ষু হইতে একবিন্দু অশ্রুপাত হইল।

সভাপণ্ডিত দামোদর প্রথমে কথা কহিলেন, “আচার্য্য, আপনি কি ফুরু হইলেন ? যেরূপ রাজাজ্ঞা হইল, ইহা শাস্ত্রসঙ্গত। শাস্ত্রে ঋষিবাক্য প্রযুক্ত আছে যে, তুরকৌয়েরা এ দেশ অধিকার করিবে। শাস্ত্রে আছে অবশ্য ঘটিবে—কাহার সাধ্য নিবারণ করে ? তবে যুদ্ধোত্তমে প্রয়োজন কি ?”

মাধবাচার্য্য কহিলেন, “ভাল সভাপণ্ডিত মহাশয়, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনি একতুক্তি কোন্ শাস্ত্রে দেখিয়াছেন ?”

দামোদর কহিলেন, “বিষ্ণুপুরাণে আছে, যথা—”

মাধ। ‘যথা’ থাকুক—“বিষ্ণুপুরাণ আনিতে অনুমতি করুন ; দেখান এরূপ উক্তি কোথায় আছে ?”

দামো । আমি কি এতই ভ্রান্ত হইলাম ? ভাল স্বরণ করিয়া দেখুন দেখি, মনুতে এ কথা আছে কি না ?

মাধ । গোড়েশ্বরের সভাপণ্ডিত মানবধর্মশাস্ত্রেরও কি পারদর্শী নহেন ?

দামো । কি জ্বালা ! আপনি আমাকে বিহ্বল করিয়া তুলিলেন । আপনার সম্মুখে সরস্বতী বিমনা হইবেন, আমি কোন্ ছার ? আপনার সম্মুখে গ্রন্থের নাম স্বরণ হইবে না ; কিন্তু কবিতাটা শ্রবণ করুন ।

মাধ । গোড়েশ্বরের সভাপণ্ডিত যে অনুষ্ঠাপছন্দে একটা কবিতা রচনা করিয়া থাকিবেন, ইহা কিছুই অসম্ভব নহে । কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি—তুরকজাতীয় কর্তৃক গোড়বিজয়বিষয়িণী কথা কোন শাস্ত্রে কোথাও নাই ।

পণ্ডপতি কহিলেন, “আপনি কি সর্কশাস্ত্রবিৎ ?”

মাধবাচার্য্য কহিলেন, “আপনি যদি পারেন, তবে আমাকে অশাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া প্রতিপন্ন করুন ?”

সভাপণ্ডিতের একজন পারিষদ কহিলেন, “আমি করিব । আত্মশ্লাঘা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ । যে আত্মশ্লাঘাপরবশ, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে ?”

মাধবাচার্য্য কহিলেন, “মূর্খ তিন জন । যে আত্ম-

- রক্ষায় যত্নহীন, যে সেই যত্নহীনতার প্রতিপোষক, আর যে আত্মবুদ্ধির অতীত বিষয়ে বাক্যব্যয় করে, ইহাৱাই মূৰ্খ । আপনি ত্রিবিধ মূৰ্খ ।”

সভাপণ্ডিতের পারিষদ অধোবদনে উপবেশন করিলেন ।

পশুপতি কহিলেন, “যবন আইসে, আমরা যুদ্ধ করিব ।”

মাধবাচার্য্য কহিলেন, “সাধু ! সাধু ! আপনার যেরূপ বশ, সেইরূপ প্রস্তাব করিলেন । জগদীশ্বর আপনাকে কুশলী করুন ! আমার কেবল এই জিজ্ঞাস্য যে, যদি যুদ্ধই অভিপ্রায়, তবে তাহার কি উদ্যোগ হইয়াছে ?”

পশুপতি কহিলেন, “মন্ত্রণা গোপনেই বক্তব্য । এ সভাতলে প্রকাশ্য নহে । কিন্তু যে অশ্ব, পদাতি, এবং নাবিকসেনা সংগৃহীত হইতেছে, কিছু দিন এই নগরী পর্যটন করিলে তাহা জানিতে পারিবেন ।”

মা । কতক কতক জানিয়াছি ।

প । তবে এ প্রস্তাব করিতেছেন কেন ?

মা । প্রস্তাবের তাৎপর্য্য এই যে, এক বীরপুরুষ এক্ষণে এখানে সমাগত হইয়াছেন । মগধের যুবরাজ হেমচন্দ্রের বীর্য্যের খ্যাতি শুনিয়া থাকিবেন ।

প । বিশেষ শুনিয়াছি । ইহাও শ্রুত আছি যে, তিনি মহাশয়ের শিষ্য । আপনি বলিতে পারিবেন যে, 'ঈদৃশ বীরপুরুষের বাহুরক্ষিত মগধরাজ্য শত্রুহস্তগত হইল কি প্রকারে ?

মা । যবনবিপ্লবের কালে যুবরাজ প্রবাসে ছিলেন । এই মাত্র কারণ ।

প । তিনি কি এক্ষণে নবদ্বীপে আগমন করিয়াছেন ?

মা । আসিয়াছেন । রাজ্যাপহারক যবন এই দেশে আগমন করিতেছে শুনিয়া এই দেশে তাহাদিগের সহিত সংগ্রাম করিয়া দস্যুর দণ্ডবিধান করিবেন । গৌড়রাজ তাহার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিয়া উভয়ে শত্রুবিনাশের চেষ্টা করিলে উভয়ের মঙ্গল ।

প । রাজবল্লভেরা অদ্যই তাঁহার পরিচর্যায় নিযুক্ত হইবে । তাঁহার নিবাসার্থ যথাযোগ্য বাসগৃহ নির্দিষ্ট হইবে । সন্ধিনিবন্ধনের মন্ত্রণা যথাযোগ্য সময়ে স্থির হইবে ।

পরে রাজ্যাজ্ঞার সভাভঙ্গ হইল ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

কুম্ভনির্মিতা ।

উপনগর প্রান্তে, গঙ্গাতীরবর্তী এক অট্টালিকা হেমচন্দ্রের বাসার্থ রাজপুরুষেরা নির্দিষ্ট করিলেন । হেমচন্দ্র মাধবাচার্য্যের পরামর্শানুসারে সুরম্য অট্টালিকায় আবাস সংস্থাপিত করিলেন ।

নবদ্বীপে জনার্দিন নামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন । তিনি বয়োবাহুল্যপ্রযুক্ত এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের হানিপ্রযুক্ত সর্বতোভাবে অসমর্থ । অথচ নিঃসহায় । তাঁহার সহধর্ম্মিণীও প্রাচীনা এবং শক্তিহীনা । কিছুদিন হইল, ইহাদিগের পর্ণকুটীর প্রবল বাতায় বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল । সেই অবধি ইহারা আশ্রয়ভাবে এই বৃহৎ পুরীর এক পার্শ্বে রাজপুরুষদিগের অনুমতি লইয়া বাস করিতেছিলেন । এক্ষণে কোন রাজপুত্র আসিয়া তথায় বাস করিবেন শুনিয়া তাঁহারা পরাধিকার ত্যাগ করিয়া বাসাস্তরের অন্বেষণে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন ।

হেমচন্দ্র উহা শুনিয়া হুঃখিত হইলেন । বিবেচনা করিলেন যে, এই বৃহৎ ভবনে আমাদিগের উভয়েরই স্থান

হইতে পারে। ব্রাহ্মণ কেন নিরাশ্রয় হইবেন। হেমচন্দ্র দিগ্বিজয়কে আজ্ঞা করিলেন, “ব্রাহ্মণকে গৃহত্যাগ করিতে নিবারণ কর।” ভৃত্য ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, “এ কার্য্য ভৃত্য দ্বারা সম্ভবে না। ব্রাহ্মণঠাকুর আমার কথা কাণে তুলেন না।”

ব্রাহ্মণ বস্তুতঃ অনেকেরই কথা কাণে তুলেন না—কেন না তিনি বধির। হেমচন্দ্র ভাবিলেন, ব্রাহ্মণ অভিমান প্রযুক্ত ভৃত্যের আলাপ গ্রহণ করেন না। এক্ষণে স্বয়ং তৎসম্ভাষণে গেলেন। ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিলেন।

জনর্দন আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

“তুমি কে?”

হে। আমি আপনার ভৃত্য।

জ। কি বলিলে—তোমার নাম রামকৃষ্ণ?

হেমচন্দ্র অনুভব করিলেন, ব্রাহ্মণের শ্রবণশক্তি বড় প্রবল নহে। অতএব উচ্চতরস্বরে কহিলেন, “আমার নাম হেমচন্দ্র। আমি ব্রাহ্মণের দাস।”

জ। ভাল ভাল; প্রথমে ভাল শুনিতে পাই নাই, তোমার নাম হুম্মান দাস।

হেমচন্দ্র মনে করিলেন, “নামের কথা দূর হউক। কার্য্যসাধন হইলেই হইল।” বলিলেন, “নবদ্বীপাধি-

পতির এই অট্টালিকা, তিনি ইহা আমার বাসের জগ্ন নিমুক্ত করিয়াছেন। স্নানাম আমার আসায় আপনি স্থান ত্যাগ করিতেছেন।”

জ। না, এখনও গঙ্গাস্নানে যাই নাই; এই স্নানের উদ্যোগ করিতেছি।

হে। (অত্যাচেষ্টায়) স্নান যথাসময়ে করিবেন। এক্ষণে আমি এই অনুরোধ করিতে আসিয়াছি, যে আপনি এ গৃহ ছাড়িয়া যাইবেন না।

জ। গৃহে আহার করিব না? তোমার বাটীতে কি? আশ্রয় শ্রদ্ধা?

হে। ভাল; আহারাদির অভিলষ করেন. তাহারও উদ্যোগ হইবে। এক্ষণে বেক্রপ এ বাড়িতে অবস্থিত করিতেছেন সেইরূপই করুন।

জ। ভাল ভাল; ব্রাহ্মণভোজন করাইলে দক্ষিণা ত আছেই। তা বলিতে হইবে না। তোমার বাড়ী কোথা?

হেমচন্দ্র হতাশাস হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে তাঁহার উত্তরীয় ধরিয়া টানিল। হেমচন্দ্র ফিরিয়া দেখিলেন। দেখিয়া প্রথম মুহূর্ত্তে তাঁহার বোধ হইল সন্মুখে একখানি কুম্মনির্মিতা

দেবীপ্রতিমা । দ্বিতীয় মুহূর্তে দেখিলেন, প্রতিমা সজীব ;
তৃতীয় মুহূর্তে দেখিলেন, প্রতিমা নহে, বিধাতার নিষ্ক্রাণ-
কৌশল-সীমা-রূপিনী বালিকা অথবা পূর্ণযৌবনা তরুণী ।

বালিকা না তরুণী ? ইহা হেমচন্দ্র তাহাকে দেখিয়া
নিশ্চিত করিতে পারিলেন না ।

বীণানিন্দিতস্বরে সুন্দরী কহিলেন, “তুমি পিতামহকে
কি বলিতেছিলে ? তোমার কথা উনি শুনিতে পাইবেন
কেন ?”

হেমচন্দ্র কহিলেন, “তাহা ত পাইলেন না দেখিলাম ।
তুমি কে ?”

বালিকা বলিল, “আমি মনোরমা ।”

হে । ইনি তোমার পিতামহ ?

মনো । তুমি পিতামহকে কি বলিতেছিলে ?

হে । শুনিলাম ইনি এ গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইবার
উদ্যোগ করিতেছেন । আমি তাই নিবারণ করিতে
আসিয়াছি ।

ম । এ গৃহে এক রাজপুত্র আসিয়াছেন । তিনি
আমাদিগকে থাকিতে দিবেন কেন ?

হে । আমিই সেই রাজপুত্র । আমি তোমাদিগকে
অমুরোধ করিতেছি, তোমরা এখানে থাক ।

ম। কেন ?

‘এ ‘কেন’র উত্তর নাই। হেমচন্দ্র অল্প উত্তর না পাইয়া কহিলেন, “কেন ? মনে কর, যদি তোমার ভাই আসিয়া এই গৃহে বাস করিত, সে কি তোমাদিগকে তাড়াইয়া দিত ?”

ম। তুমি কি আমার ভাই ?

হে। আজি হইতে তোমার ভাই হইলাম। এখন বুঝিলে ?

ম। বুঝিয়াছি। কিন্তু ভগিনী বলিয়া আমাকে কখন তিরস্কার করিবে না ত ?

হেমচন্দ্র মনোরমার কথার প্রণালীতে চমৎকৃত হইতে লাগিলেন। ভাবিলেন, “এ কি অলৌকিক সরলা বালিকা ? না উন্মাদিনী ?” কহিলেন, “কেন তিরস্কার করিব ?”

ম। যদি আমি দোষ করি ?

হে। দোষ দেখিলে কে না তিরস্কার করে ?

মনোরমা ক্ষুণ্ণভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, বলিলেন, “আমি কখন ভাই দেখি নাই; ভাইকে কি সজ্জা করিতে হয় ?”

হে। না।

ম । তবে আমি তোমাকে লজ্জা করিব না—তুমি আমাকে লজ্জা করিবে ?

হেমচন্দ্র হাসিলেন—কহিলেন, “আমার বক্তব্য তোমার পিতামহকে জানাইতে পারিলাম না,—তাহার উপায় কি ?”

ন । আমি বলিতেছি ।

এই বলিয়া মনোরমা মৃদু মৃদু স্বরে জনার্দনের নিকট হেমচন্দ্রের অভিপ্রায় জানাইলেন । হেমচন্দ্র দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে মনোরমার সেই মৃদু কথা বধিরের বোধগম্য হইল ।

ব্রাহ্মণ আনন্দিত হইয়া রাজপুত্রকে আশীর্বাদ করিলেন এবং কহিলেন, “মনোরমা, ব্রাহ্মণীকে বল, রাজপুত্র তাঁহার নাতি হইলেন—আশীর্বাদ করুন ।” এই বলিয়া ব্রাহ্মণ স্বয়ং “ব্রাহ্মণি ! ব্রাহ্মণি !” বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন । ব্রাহ্মণী তখন স্থানান্তরে গৃহকার্যে ব্যাপ্তা ছিলেন—ডাক শুনিতে পাইলেন না । ব্রাহ্মণ অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, “ব্রাহ্মণীর ঐ বড় দোষ । কাণে কম শোনে ।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

নৌকাঘানে ।

হেমচন্দ্র ত উপবনগৃহে সংস্থাপিত হইলেন । আর মৃগালিনী? নির্ধাসিতা, পরপীড়িতা, সহায়হীনা মৃগালিনী কোথায় ?

সন্ধ্যাগগনে রক্তিম মেঘমালা কাঞ্চনবর্ণ ত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল । রজনীদত্ত তিমিরাবরণে গঙ্গার বিশাল হৃদয় অম্পষ্টীকৃত হইল । সভামণ্ডলে পরিচারকহস্তজ্বালিত দীপমালার জ্বাল, অথবা প্রভাতে উজ্জ্বলকুমুমসমূহের জ্বাল, আকাশে নক্ষত্রগণ ফুটিতে লাগিল । প্রায়াক্ককার নদীহৃদয়ে নৈশ সমীরণ কিঞ্চিৎ ধরতরবেগে বহিতে লাগিল । তাহাতে রমণীহৃদয়ে নায়কসংস্পর্শজনিত প্রকম্পের জ্বাল নদীফেনপুঞ্জ শ্বেতপুষ্পমালা গ্রথিত হইতে লাগিল । বহুলোকের কোলাহলের জ্বাল বীচিরব উখিত হইল । নাবিকেরা নৌকা সকল তীরলগ্ন করিয়া, রাত্রির অন্ত বিশ্রামের ব্যবস্থা করিতে লাগিল । তন্মধ্যে একখানি ছোট ডিকী অন্ত

নৌকা হইতে পৃথক্ এক খালের মুখে লাগিল। নাবিকেরা
আহারাদির ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

ক্ষুদ্র তরণীতে দুইটীমাত্র আরোহী। দুইটীই স্ত্রীলোক।
পাঠককে বলিতে হইবে না, ইহারা মৃগালিনী আর
গিরিজায়া।

গিরিজায়া মৃগালিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিল,
“আজিকার দিন কাটিল।”

মৃগালিনী কোন উত্তর করিল না।

গিরিজায়া পুনরপি কহিল, “কালিকার দিনও কাটিবে
—পরদিনও কাটিবে—কেন কাটিবে না?”

মৃগালিনী তথাপি কোন উত্তর করিলেন না। কেবল
মাত্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

গিরিজায়া কহিল, “ঠাকুরাণি! এ কি এ? দিবানিশি
চিন্তা করিয়া কি হইবে? যদি আমাদের নদীয়া
আমা কাজ ভাল না হইয়া থাকে, চল, এখনও ফিরিয়া
যাই।”

মৃগালিনী এবার উত্তর করিলেন। বলিলেন, “কোথায়
যাইবে?”

গ। চল ছবীকেশের বাড়ী যাই।

মৃ। বরং এই গঙ্গাজলে ডুবিয়া মরিব।

গি । চল তবে মথুরায় যাই ।

মৃ । আমি ত বলিয়াছি তথায় আমার স্থান নাই ।
কুলটার ঠায় রাত্রিকালে যে বাপের ঘর ছাড়িয়া আসি-
রাছি, কি বলিয়া সে বাপের ঘরে আর মুখ দেখাইব ?

গি । কিন্তু তুমি ত আপন ইচ্ছায় আইস নাই, মন্দ
ভাবিয়াও আইস নাই । যাইতে ক্ষতি কি ?

মৃ । সে কথা কে বিশ্বাস করিবে ? যে বাপের ঘরে
আদরের প্রতিমা ছিলাম, সে বাপের ঘরে ঘণিত হইয়াই
বা কি প্রকারে থাকিব ?

গিরিজায়া অন্ধকারে দেখিতে পাইল না যে, মৃগালিনীর
চক্ষু হইতে বারিবিन्दুর পর বারিবিन्दু পড়িতে লাগিল ।
গিরিজায়া কহিল, “তবে কোথায় যাইবে ?”

মৃ । সেখানে যাইতেছি ।

গি । সে ত সুখের যাত্রা । তবে অন্তমন কেন ?
যাহাকে দেখিতে ভালবাসি, তাহাকে দেখিতে যাইতেছি,
ইহার অপেক্ষা সুখ আর কি আছে ?

মৃ । নদীয়ায় আমার সহিত হেমচন্দ্রের সাক্ষাৎ
হইবে না ।

গি । কেন ? তিনি কি সেখানে নাই ?

মৃ । সেইখানেই আছেন । কিন্তু তুমি ত জান যে

আমার সহিত এক বৎসর অসাক্ষাৎ তাঁহার ব্রত । আমি কি সে ব্রত ভঙ্গ করাইব ?

গিরিজায়া নীরব হইয়া রহিল । যুগালিনী আবার কহিলেন, “আর কি বলিয়াই বা তাঁহার নিকট দাঁড়াইব ? আমি কি বলিব যে, হৃষীকেশের উপর রাগ করিয়া আসিয়াছি, না, বলিব যে, হৃষীকেশ আমাকে কুলটা বলিয়া বিদায় করিয়া দিয়াছে ?”

গিরিজায়া ক্ষণেক নীরব থাকিয়া কহিল, “তবে কি নদীয়ায় তোমার সঙ্গে হেমচন্দ্রের সাক্ষাৎ হইবে না ?”

যু। না।

গি। তবে যাইতেছ কেন ?

যু। তিনি আমাকে দেখিতে পাইবেন না । কিন্তু আমি তাঁহাকে দেখিব । তাঁহাকে দেখিতেই যাইতেছি ।

গিরিজায়ার মুখে হাসি ধরিল না । বলিল, “তবে আমি গীত গাই,

“চরণতলে দিখু হে শ্যাম পরাণ রতন ।
দিব না তোমারে নাথ মিছার যৌবন ॥
এ রতন সমতুল ইহা তুমি দিবে যুল,
দিবানিশি মোরে নাথ দিবে দরশন ॥”

ঠাকুরাণি, তুমি তাঁহাকে দেখিয়া ত জীবনধারণ

করিবে । আমি তোমার দাসী হইয়াছি, আমার ত তাহাতে পেট ভরিবে না, আমি কি খেয়ে বাঁচিব ?”

মৃ। আমি ছই একটা শিল্পকর্ম জানি । মালা গাঁথিতে জানি, চিত্র করিতে জানি, কাপড়ের উপর ফুল তুলিতে জানি । তুমি বাজারে আমার শিল্পকর্ম বিক্রয় করিয়া দিবে ।

গিরি । আর আমি ঘরে ঘরে গীত গায়িব । “মৃগাল অধমে” গাইব কি ?

মৃগালিনী অর্দ্ধহাস্ত, অর্দ্ধ সর্কোপ দৃষ্টিতে গিরিজায়ার প্রতি কটাক্ষ করিলেন ।

গিরিজায়া কহিল, “অমন করিয়া চাহিলে আমি গীত গায়িব ।” এই বলিয়া গায়িল,

“সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে ।
কে আছে কাণ্ডারী হেন কে যাইবে সঙ্গে ॥”

মৃগালিনী কহিল, “যদি এত ভয়, তবে একা এলে কেন ?”

গিরিজায়া কহিল, “আগে কি জানি ।” বলিয়া গায়িতে লাগিল,

“ভাস্মল তরী সকাল ৫ বলা, ভাবিলাম এ জলখেলা,
মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাব রঙ্গে ।

এখন—গগনে পরজে ঘন, বহে খর সমীরণ,
কূল তাজি এলাম কেন, ময়িতে আতঙ্গে ।”

মৃগালিনী কহিল, “কূলে ফিরিয়া যাও না কেন ?”

গিরিজায়া গায়িতে লাগিল,

“মনে করি কূলে ফিরি, বাহি তরি ধীরি ধীরি,
কূলেতে কণ্টক-তরু বেষ্টিত ভুজঙ্গে ।”

মৃগালিনী কহিলেন, “তবে ডুবিয়া মর না কেন ?”

গিরিজায়া কহিল, “মরি তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু”

বলিয়া আবার গায়িল,

“যাহারে কাণ্ডারী করি, সাজাইয়া দিনু তরি,
সে কভু না দিল পদ তরণীর অঙ্গে ।”

মৃগালিনী কহিলেন, “গিরিজায়া, এ কোন্ অগ্রে-
মিকের গান ।”

গি । কেন ?

মৃ । আমি হইলে তরি ডুবাই ।

গি । সাধ করিয়া ?

মৃ । সাধ করিয়া ।

গি । তবে তুমি জলের ভিতর রত্ন দেখিয়াছ ।

যুগালিনী ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

বাতায়নে ।

হেমচন্দ্র কিছুদিন উপবনগৃহে বাস করিলেন ! জনার্দনের সহিত প্রত্যহ সাক্ষাৎ হইত ; কিন্তু ব্রাহ্মণের বধিরতা প্রযুক্ত ইঙ্গিতে আলাপ হইত মাত্র । মনোরমার সহিতও সর্বদা সাক্ষাৎ হইত, মনোরমা কখন তাঁহার সহিত উপযাচিকা হইয়া কথা কহিতেন, কখন বা বাক্য-ব্যয় না করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যাইতেন । বস্তুতঃ মনোরমার প্রকৃতি তাঁহার পক্ষে অধিকতর বিশ্বয়জনক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল । প্রথমতঃ তাঁহার বয়ঃক্রম দুয়ুস্মের, সহজে তাঁহাকে বালিকা বলিয়া বোধ হইত, কিন্তু কখন কখন মনোরমাকে অতিশয় গাঙ্গীর্ষ্যশালিনী দেখিতেন । মনোরমা কি অদ্যাপি কুমারী ? হেমচন্দ্র একদিন কথোপকথনচ্ছলে মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মনোরমা, তোমার স্বত্তরবাড়ী কোথা ?” মনোরমা কহিল, “বলিতে পারি না !” আর একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “মনোরমা, তুমি কয় বৎসরের হইয়াছ ?”

মনোরমা তাহাতেও উত্তর দিয়াছিলেন, “বলিতে পারি না।” ,

মাধবাচার্য্য হেমচন্দ্রকে উপবনে স্থাপিত করিয়া দেশ-পর্যটনে যাত্রা করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, এ সময় গোড়দেশীয় অধীন রাজগণ যাহাতে নবদ্বীপে সসৈন্ত সমবেত হইয়া গোড়েশ্বরের আনুকূল্য করেন, তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগকে প্রবৃত্তি দেন। হেমচন্দ্র নবদ্বীপে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিষ্ফল দিনযাপন ক্রেশকর হইয়া উঠিল। হেমচন্দ্র বিরক্ত হইলেন। এক একবার মনে হইতে লাগিল যে, দিগ্বিজয়কে গৃহরক্ষায় রাখিয়া অশ্ব লইয়া একবার গোড়ে গমন করেন। কিন্তু তথায় মৃগালিনীর সাক্ষাৎ লাভ করিলে তাঁহার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হইবে, বিনা সাক্ষাতে গোড়যাত্রায় কি ফলোদয় হইবে? এই সকল আলোচনায় যদিও গোড়যাত্রায় হেমচন্দ্র নিরস্ত হইলেন, তথাপি অল্পদিন মৃগালিনীচিন্তায় হৃদয় নিযুক্ত থাকিত। একদা প্রদোষকালে তিনি শয়নকক্ষে, পর্যাক্ষোপরি শয়ন করিয়া মৃগালিনীর চিন্তা করিতেছিলেন। চিন্তাতেও হৃদয় সুখলাভ করিতেছিল। মুক্ত বাতায়নপথে হেমচন্দ্র প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। নবীন

শরৎদয় । রজনী চন্দ্রিকাশালিনী, আকাশ নিম্নল, বিস্তৃত, নক্ষত্রখচিত, কচিং স্তরপরম্পরাবিহ্বস্ত শ্বেতাশুদ-মালায় বিভূষিত। বাতায়নপথে অদূরবর্তিনী ভাগীরথীও দেখা যাইতেছিল ; ভাগীরথী বিশালোরসী, বহুদূর বিসর্পিনী, চন্দ্রকর-প্রতিঘাতে উজ্জ্বলতরঙ্গিনী, দূরপ্রান্তে ধূমময়ী, নববারি-সমাগম-প্রহ্লাদিনী । নববারি-সমাগম জনিত কল্লোল হেমচন্দ্র গুণিতে পাইতেছিলেন । বাতায়নপথে বায়ু প্রবেশ করিতেছিল । বায়ু, গঙ্গাতরঙ্গে নিক্ষিপ্ত জলকণা-সংস্পর্শে শীতল, নিশাসমাগমে প্রফুল্ল বন্যকুমুমসংস্পর্শে সুগন্ধি ; চন্দ্রকর-প্রতিঘাতী শ্রামোজ্জ্বল বৃক্ষপত্র বিধৃত করিয়া, নদীতীরবিরাজিত কাশকুমুম আন্দোলিত করিয়া, বায়ু বাতায়নপথে প্রবেশ করিতেছিল । হেমচন্দ্র বিশেষ প্রীতিলাভ করিলেন।

অকস্মাৎ বাতায়নপথ অন্ধকার হইল—চন্দ্রালোকের গতি রোধ হইল । হেমচন্দ্র বাতায়নসন্নিধি একটা মনুষ্যমুণ্ড দেখিতে পাইলেন । বাতায়ন, ভূমি হইতে কিছু উচ্চ—এজন্য কাহারও হস্তপদাদি কিছু দেখিতে পাইলেন না—কেবল একখানি মুখ দেখিলেন । মুখখানি অতি বিশালশুক্লসংযুক্ত, তাহার মস্তকে উষ্ণীষ । সেই উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে, বাতায়নের নিকটে, সম্মুখে

শ্রুতসংস্কৃত উষীষধারী মনুষ্যমুণ্ড দেখিয়া, হেমচন্দ্র শয্যা
হইতে লক্ষ্য দিয়া নিজ শাণিত অসি গ্রহণ করিলেন ।

অসি গ্রহণ করিয়া হেমচন্দ্র চাহিয়া দেখিলেন যে,
বাতায়নে আর মনুষ্যমুণ্ড নাই ।

হেমচন্দ্র অসিহস্তে দ্বারোদঘাটন করিয়া গৃহ হইতে
নিক্রান্ত হইলেন । বাতায়নতলে আসিলেন । তথায়
কেহ নাই ।

গৃহের . চতুঃপার্শ্বে, গঙ্গাতীরে, বনমধ্যে হেমচন্দ্র
ইতস্ততঃ অব্বেষণ করিলেন । কোথাও কাহাকে দেখি-
লেন না ।

হেমচন্দ্র গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন । তখন রাজপুত্র
পিতৃদত্ত যোদ্ধ্বেশে আপাদমস্তক আত্মশরীর মণ্ডিত
করিলেন । অকালজলদোদয়বিমর্ষিত গগনমণ্ডলবৎ তাঁহার
সুন্দর মুখকান্তি অন্ধকারময় হইল । তিনি একাকী
সেই গম্ভীর নিশাতে শব্দময় হইয়া যাত্রা করিলেন ।
বাতায়নপথে মনুষ্যমুণ্ড দেখিয়া তিনি জানিতে পারিয়া-
ছিলেন যে, বস্তু তুরক আসিয়াছে ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

বাপীকূলে ।

অকালজলদোদরস্বরূপ ভীমমূর্তি রাজপুত্র হেমচন্দ্র তুরকের অশেষে নিষ্ক্রান্ত হইলেন । ব্যাত্র যেমন আহাণ্য দেখিবামাত্র বেগে ধাবিত হয়, হেমচন্দ্র তুরক দেখিবামাত্র সেইরূপ ধাবিত হইলেন । কিন্তু কোথায় তুরকের সাক্ষাৎ পাইবেন, তাহার স্থিরতা ছিল না ।

হেমচন্দ্র একটীমাত্র তুরক দেখিরাছিলেন । কিন্তু তিনি এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, হয় তুরকসেনা নগরসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া লুক্কায়িত আছে, নতুবা এই ব্যক্তি তুরকসেনার পূর্বচর । যদি তুরকসেনাই আসিয়া থাকে, তবে তৎসঙ্গে একাকী সংগ্রাম সম্ভবে না । কিন্তু বাহাই হউক, প্রকৃত অবস্থা কি তাহার অনুসন্ধান না করিয়া হেমচন্দ্র কদাচ স্থির থাকিতে পারেন না । যে মহৎ কার্য জন্ত যুগালিনীকে ত্যাগ করিয়াছেন, অদ্য রাত্রিতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সে কর্মে উপেক্ষা করিতে পারেন না । বিশেষ ক্ষণে হেমচন্দ্রের আন্তরিক আনন্দ । উষ্ণীয়-

ধারী মুণ্ড দেখিয়া অবধি তাঁহার জিঘাংসা ভয়ানক প্রবল হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার স্থির হইবার সম্ভাবনা কি ? অতএব দ্রুতপদবিক্ষেপে হেমচন্দ্র রাজপথাভিমুখে চলিলেন ।

উপবনগৃহ হইতে রাজপথ কিছু দূর । যে পথ বাহিত করিয়া উপবনগৃহ হইতে রাজপথে যাইতে হয়, সে বিরল-লোক-প্রবাহ গ্রাম্য পথ মাত্র । হেমচন্দ্র সেই পথে চলিলেন । সেই পথপার্শ্বে অতি বিস্তারিত, সুরম্য সোপানাবলিশোভিত, এক দীর্ঘিকা ছিল । দীর্ঘিকাপার্শ্বে অনেক বকুল, শাল, অশোক, চম্পক, কদম্ব, অশ্বথ, বট, আম্র, তিস্তিড়ী প্রভৃতি বৃক্ষ ছিল । বৃক্ষগুলি যে সুশৃঙ্খলরূপে শ্রেণীবিন্যস্ত ছিল এমন নহে, বহুতর বৃক্ষ পরস্পর শাখায় শাখায় সম্বন্ধ হইয়া বাণীতীরে ঘনান্দকার করিয়া রহিত । দিবসেও তথায় অন্ধকার । কিম্বদন্তী ছিল যে, সেই সরোবরে ভূতযোনি বিহার করিত । এই সংস্কার প্রতি-বাসীদিগের মনে এরূপ দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছিল যে সচরাচর তথায় কেহ যাইত না । যদি যাইত, তবে একাকী কেহ যাইত না । নিশাকালে কদাপি কেহ যাইত না ।

পৌরাণিক ধর্মের একাধিপত্যকালে হেমচন্দ্রও ভূত-যোনির অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রত্যয়শালী হইবেন, তাহার আশঙ্কা

বিচিত্র কি ? কিন্তু প্রেতস্বন্ধে প্রত্যয়শালী বলিয়া তিনি গন্তব্য পথে যাইতে সঙ্কোচ করেন, এরূপ ভীকৃষ্ণভাব নহেন । অতএব তিনি নিঃসঙ্কোচ হইয়া বাপীপার্শ্ব দিয়া চলিলেন । নিঃসঙ্কোচ বটে, কিন্তু কোতূহলশূন্য নহেন । বাপীর পার্শ্বে সর্বত্র এবং তত্তীরপ্রতি অনিমেষলোচন নিষ্ক্রিপ্ত করিতে করিতে চলিলেন । সোপানমার্গের নিকটবর্তী হইলেন । সহসা চমকিত হইলেন । জন-শ্রুতির প্রতি তাঁহার বিশ্বাস দৃঢ়ীকৃত হইল । দেখিলেন, চন্দ্রালোকে সর্বাধঃস্থ সোপানে, জলে চরণ রক্ষা করিয়া শ্বেতবসনপরিধানা কে বসিয়া আছে । স্ত্রীমূর্তি বলিয়া তাঁহার বোধ হইল । শ্বেতবসনা অবৈণীসম্বন্ধকুস্তলা ; কেশজাল স্কন্ধ, পৃষ্ঠদেশ, বাহুযুগল, মুখমণ্ডল, হৃদয়, সর্বত্র আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে । প্রেত বিবেচনা করিয়া হেম-চন্দ্র নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছিলেন । কিন্তু মনে ভাবিলেন, যদি মনুষ্য হয় ? এত রাত্রে কে এ স্থানে ? যে ত তুরককে দেখিলে দেখিয়া থাকিতে পারে ? এই সন্দেহে হেমচন্দ্র ফিরিলেন । নির্ভয়ে বাপীতীরারোহণ করিলেন, সোপানমার্গে ধীরে ধীরে অবতরণ করিতে লাগিলেন । প্রেতিনী তাঁহার আগমন জানিতে পারিয়াও স্মরিল না । পূর্বমত রহিল । হেমচন্দ্র তাঁহার নিকটে

আসিলেন । তখন সে উঠিয়া দাঁড়াইল । হেমচন্দ্রের দিকে ফিরিল ; হস্তদ্বারা মুখাবরণকারী কেশদাম অপসৃত করিল । হেমচন্দ্র তাহার মুখ দেখিলেন । সে প্রেতিনী নহে, কিন্তু প্রেতিনী হইলে হেমচন্দ্র অধিকতর বিস্ময়াপন্ন হইতেন না । কহিলেন, “কে, মনোরমা ! তুমি এখানে ?”

মনোরমা কহিল, “আমি এখানে অনেকবার আসি—
কিন্তু তুমি এখানে কেন ?”

হেম । আমার কৰ্ম্ম আছে ।

মনো । এ রাত্রে কি কৰ্ম্ম ?

হেম । পশ্চাৎ বলিল ; তুমি এ রাত্রে এখানে কেন ?

মনো । তোমার এ বেশ কেন ? হাতে শূল ;
কাঁকালে তরবারি ; তরবারে এ কি জলিতেছে ? এ কি
হীরা ? মাথায় এ কি ? ইহাতে ঝক্‌মক্‌ করিয়া জলি-
তেছে, এই বা কি ? এও কি হীরা ? এত হীরা পেলে
কোথা ?

হেম । আমার ছিল ।

মনো । এ রাত্রে এত হীরা পরিয়া কোথায় বাইতেছ ?
চোরে যে কাড়িয়া লইবে ?

হেম । আমার নিকট হইতে চোরে কাড়িতে পারে
না ।

মনো । তা এত রাত্রে এত অলঙ্কারে প্রয়োজন কি ?
তুমি কি বিবাহ করিতে যাইতেছ ?

হেম । তোমার কি বোধ হয়, মনোরমা ?

মনো । মানুষ মারিবার অস্ত্র লইয়া কেহ বিবাহ
করিতে যায় না । তুমি যুদ্ধে যাইতেছ ।

হেম । কাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিল ? তুমিই বা এখানে
কি করিতেছিলে ?

মনো । স্নান করিতেছিলাম । স্নান করিয়া বাতাসে
চুল শুকাইতেছিলাম । এই দেখ চুল এখনও ভিজা
রহিয়াছে ।

এই বলিয়া মনোরমা আর্দ্র কেশ হেমচন্দ্রের হস্তে স্পর্শ
করাইলেন ।

হেম । রাত্রে স্নান কেন ?

মনো । আমার গা জ্বালা করে ।

হেম । গঙ্গাস্নান না করিয়া এখানে কেন ?

মনো । এখানকার জল বড় শীতল ।

হেম । তুমি সর্বদা এখানে আইস ?

মনো । আসি ।

হেম । আমি তোমার সম্বন্ধ করিতেছি—তোমার
বিবাহ হইবে । বিবাহ হইলে এরূপ কি প্রকারে আসিবে ?

মনো । আগে বিবাহ হউক ।

হেমচন্দ্র হাসিয়া কহিলেন, “তোমার লজ্জা নাই—
তুমি কালামুখী ।”

মনো । তিরস্কার কর কেন ? তুমি যে বলিয়াছিলে
তিরস্কার করিবে না ।

হেম । সে অপরাধ লইও না । এখান দিয়া কাহা-
কেও যাইতে দেখিয়াছ ?

মনো । দেখিয়াছি ।

হেম । তাহার কি বেশ ?

মনো । তুরকের বেশ ।

হেমচন্দ্র অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন ; বলিলেন, “সে
কি ? তুমি তুরক চিনিলে কি প্রকারে ?”

মনো । আমি পূর্বে তুরক দেখিয়াছি ।

হেম । সে কি ? কোথায় দেখিলে ?

মনো । যেখানে দেখি না—তুমি কি সেই তুরকের
অনুসরণ করিবে ?

হেম । করিব—সে কোন্ পথে গেল ?

মনো । কেন ?

হেম । তাহাকে বধ করিব ।

মনো । মানুষ মেরে কি হবে ?

হেম । তুরক আমার পরম শত্রু ।

মনো । তবে একটি মারিয়া কি তৃপ্তি লাভ করিবে ?

হেম । আমি বত তুরক দেখিতে পাইব, তত মারিব ।

মনো । পারিবে ?

হেম । পারিব ।

মনোরমা বলিল, “তবে সাবধানে আমার সঙ্গে আইস ।”

হেমচন্দ্র ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন । বনযুদ্ধে এই বালিকা পথপ্রদর্শিনী !

মনোরমা তাঁহার মানসিক ভাব বুঝিলেন ; বলিলেন, “আমাকে বালিকা ভাবিয়া অবিশ্বাস করিতেছ ?”

হেমচন্দ্র মনোরমার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন । বিশ্বাস-পন্ন হইয়া ভবিলেন—মনোরমা কি মানুষী !

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

পশুপতি ।

গৌড়দেশের ধর্ম্যাধিকার পশুপতি অসাধারণ ব্যক্তি ; তিনি দ্বিতীয় গৌড়েশ্বর । রাজা বৃদ্ধ, বার্কিক্যের ধর্ম্মানুসারে পরমভাবলম্বী, এবং রাজকার্যে অযত্নবান্ হইয়াছিলেন, সুতরাং প্রধানামাত্য ধর্ম্মাধিকারের হস্তেই গৌড়রাজ্যের প্রকৃত ভার অর্পিত হইয়াছিল । এবং সম্পদে অথবা ঐশ্বর্যে পশুপতি গৌড়েশ্বরের সমকক্ষ ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছিলেন ।

পশুপতির বয়ঃক্রম পঞ্চত্রিংশৎ বৎসর হইবে । তিনি দেখিতে অতি সুপুরুষ । তাঁহার শরীর দীর্ঘ, বক্ষ বিশাল, সর্বাস্ত্র অস্থিমাংসের উপযুক্ত সংযোগে সুন্দর । তাঁহার বর্ণ তপ্তকাক্ষনসন্নিভ ; ললাট অতি বিস্তৃত, মানসিক শক্তির মন্দিরস্বরূপ । নাসিকা দীর্ঘ এবং উন্নত, চক্ষু সুদ্র, কিন্তু অসাধারণ ঔজ্জ্বল্য-সম্পন্ন । মুখকান্তি জ্ঞান-গাভীর্ঘ্যব্যঞ্জক এবং অল্পদিন বিষয়াতুষ্ঠানজনিত চিন্তার স্তরে কিছু পুরুষভাবপ্রকাশক । তাহা হইলে কি হয় ।

রাজসভাতলে তাঁহার ঞ্চায় সর্বাঙ্গসুন্দর পুরুষ আর কেহই ছিল না। লোকে বলিত, গোড়দেশে তাদৃশ পণ্ডিত এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিও কেহ ছিল না।

পশুপতি জ্ঞাতিতে ব্রাহ্মণ, কিন্তু তাঁহার জন্মভূমি কোথা, তাহা কেহ বিশেষ জ্ঞাত ছিল না। কথিত ছিল যে, তাঁহার পিতা শাস্ত্রব্যবসায়ী দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন।

পশুপতি কেবল আপন বুদ্ধিবিচার প্রভাবে গোড় রাজ্যের প্রধান পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

পশুপতি যৌবনকালে কাশীধামে পিতার নিকট থাকিয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেন। তথায় কেশব নামে এক বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। হৈমবতী নামে কেশবের এক অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা ছিল। তাহার সহিত পশুপতির পরিণয় হয়। কিন্তু অদৃষ্ট বশতঃ বিবাহের রাত্রেই কেশব, সম্প্রদানের কন্যা লইয়া অদৃশ্য হইল। আর তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। সেই পর্য্যন্ত পশুপতি পত্নীসহবাসে বঞ্চিত ছিলেন। কারণবশতঃ একাল পর্য্যন্ত দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহ করেন নাই। তিনি এক্ষণে রাজপ্রাসাদতুল্য উচ্চ অট্টালিকায় বাস করিতেন, কিন্তু বামা-নয়ন-নিঃসৃত জ্যোতির অভাবে সেই উচ্চ অট্টালিকা আজি অন্ধকারময়।

আজি রাত্রে সেই উচ্চ অট্টালিকার এক নিভৃত কক্ষে

পশুপতি একাকী দীপালোকে বসিয়া আছেন । এই কক্ষের পশ্চাতেই আত্রকানন । আত্রকাননে নিজ্রাস্ত হইবার জন্য একটা গুপ্তদ্বার আছে । সেই দ্বারে আসিয়া নিশীথকালে, যুহু যুহু কে আঘাত করিল । গৃহাভ্যন্তর হইতে পশুপতি দ্বার উদ্বাটিত করিলেন । এক ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করিল । সে মুসলমান । হেমচন্দ্র তাহাকেই বাতায়নপথে দেখিয়াছিলেন । পশুপতি, তখন তাহাকে পৃথগাসনে উপবেশন করিতে বলিয়া বিশ্বাসজনক অভিজ্ঞান দেখিতে চাহিলেন । মুসলমান অভিজ্ঞান দৃষ্ট করাইলেন ।

পশুপতি সংস্কৃতে কহিলেন, “বুঝিলাম আপনি তুরক-সেনাপতির বিশ্বাসপাত্র । সুতরাং আমারও বিশ্বাসপাত্র । আপনাই নাম মহম্মদ আলি ? এক্ষণে সেনাপতির অভিপ্রায় প্রকাশ করুন ।”

বখন সংস্কৃতে উত্তর দিলেন, কিন্তু তাঁহার সংস্কৃতির তিন ভাগ ফরাসী, আর অবশিষ্ট চতুর্থভাগ যেরূপ সংস্কৃত তাহা ভারতবর্ষে কখন ব্যবহৃত হয় নাই । তাহা মহম্মদ আলিরই সৃষ্ট সংস্কৃত । পশুপতি বহুকষ্টে তাহার অর্থবোধ করিলেন । পাঠক মহাশয়ের সে কষ্টভোগের প্রয়োজন নাই, আমরা তাঁহার সুবোধার্থে সে নূতন সংস্কৃত অনুবাদ করিয়া দিতেছি ।

যবন কহিল, “খিলিজি সাহেবের অভিপ্রায় আপনি অবগত আছেন। বিনা যুদ্ধে গোড়বিজয় করিবেন তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছে। কি হইলে আপনি এ রাজ্য তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবেন ?”

পশুপতি কহিলেন, “আমি এ রাজ্য তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিব কি না তাহা অনিশ্চিত। স্বদেশবৈরিতা মহাপাপ। আমি এ কৰ্ম্ম কেন করিব ?”

য। উত্তম। আমি চলিলাম। কিন্তু আপনি তবে কেন খিলিজির নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন ?

প। তাঁহার যুদ্ধের সাধ কতদূর পর্য্যন্ত, তাহা জানিবার জন্ত।

য। তাহা আমি আপনাকে জানাইয়া যাই। যুদ্ধেই তাঁহার আনন্দ।

প। মনুষ্যযুদ্ধে পশুযুদ্ধে চ ? হস্তিযুদ্ধে কেমন আনন্দ ?

মহম্মদ আলি সকোপে কহিলেন, “গোড়ে যুদ্ধের অভিপ্রায়ে আসা পশুযুদ্ধেই আসা। বুঝিলাম ব্যঙ্গ করিবার জন্যই আপনি সেনাপতিকে লোক পাঠাইতে বলিয়াছিলেন। আমরা যুদ্ধ জানি, ব্যঙ্গ জানি না। বাহ্য জানি তাহা করিব।”

এই বলিয়া মহম্মদ আলি ঝমনোদ্যোগী হইল । পশু-
পতি কহিলেন,

“ক্লেম অপেক্ষা করুন । আর কিছু গুনিয়া যান ।
আমি যখনহস্তে এ রাজ্য সমর্পণ করিতে অসম্মত নহি ;—
অক্ষমও নহি । আমিই গোড়ের রাজা, সেনরাজা নাম-
মাত্র । কিন্তু সমুচিত মূল্য না পাইলে আপন রাজ্য কেন
আপনাদিগকে দিব ?”

মহম্মদ আলি কহিলেন, “আপনি কি চাহেন ?”

প । খিলিজি কি দিবেন ?

য । আপনার যাহা আছে, তাহা সকলই থাকিবে—
আপনার জীবন, ঐশ্বর্য্য, পদ সকলই থাকিবে । এই
মাত্র ।

প । তবে আমি পাইলাম কি ? এ সকলই ত আমার
আছে—কি লোভে আমি এ গুরুতর পাপানুষ্ঠান করিব ?

য । আমাদের আনুকূল্য না করিলে কিছুই থাকিবে
না ; যুদ্ধ করিলে, আপনার ঐশ্বর্য্য, পদ, জীবন, পর্য্যস্ত
অপহৃত হইবে ।

প । তাহা যুদ্ধ শেষ না হইলে বলা যায় না ।
আমরা যুদ্ধ করিতে একেবারে অনিচ্ছুক বিবেচনা
করিবেন না, বিশেষ মগধে বিদ্রোহের উদ্যোগ হই-

তেছে, তাহাও অবগত আছি। তাহার নিবারণ জন্ত এক্ষণে খিলিজি ব্যস্ত, গোড়জয় চেষ্টা আপাততঃ কিছু দিন তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হইবে তাহাও অবগত আছি। আমার প্রার্থিত পুরস্কার না দেন না দেবেন; কিন্তু যুদ্ধ করাই যদি স্থির হয়, তবে আমাদিগের এই উত্তম সময়। যখন বিহারে বিদ্রোহীসেনা সজ্জিত হইবে গোড়েশ্বরের সেনাও সাজিবে।

ম। কতি কি? পিপ্‌ড়ের কামড়ের উপর মশা কামড়াইলে হাতী মরে না। কিন্তু আপনার প্রার্থিত পুরস্কার কি, তাহা শুনিয়া যাইতে বাসনা করি।

প। শুনুন। আমিই এক্ষণে প্রকৃত গোড়ের ঈশ্বর, কিন্তু লোকে আমাকে গোড়েশ্বর বলে না। আমি স্বনামে রাজা হইতে বাসনা করি। সেনবংশ লোপ হইয়া পশুপতি গোড়াধিপতি হউক।

ম। তাহাতে আমাদিগের কি উপকার করিলেন? আমাদিগকে কি দিবেন?

প। রাজ্যের মাত্র। মুসলমানের অধীনে করপ্রদ মাত্র রাজ্য হইবে।

ম। ভাল; আপনি যদি প্রকৃত গোড়েশ্বর, রাজা যদি আপনার একরূপ করতলস্থ, তবে আমাদিগের সহিত

আপনার কথাবার্তার আবশ্যক কি ? আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন কি ? আমাদেরকে কর দিবেন কেন ?

প। তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিব। ইহাতে কপটতা করিব না। প্রথমতঃ, সেনরাজ আমার প্রভু ; বয়সে বৃদ্ধ, আমাকে স্নেহ করেন। স্ববলে যদি আমি তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করি--তবে অত্যন্ত লোকনিন্দা। আপনারা কিছুমাত্র যুদ্ধোদ্যম দেখাইয়া আমার আত্মকুলো বিনা যুদ্ধে রাজধানী প্রবেশপূর্বক তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আমাকে তদুপরি স্থাপিত করিলে সে নিন্দা হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, রাজ্য অনধিকারীর অধিকারগত হইলেই বিদ্রোহের সম্ভাবনা, আপনাদিগের সাহায্যে সে বিদ্রোহ সহজেই নিবারণ করিতে পারিব। তৃতীয়তঃ, আমি স্বয়ং রাজা, হইলে এক্ষণে সেনরাজার সহিত আপনাদিগের যে সম্বন্ধ, আমার সঙ্গেও সেই সম্বন্ধ থাকিবে। আমাদের সহিত যুদ্ধের সম্ভাবনা থাকিবে। যুদ্ধে আমি প্রস্তুত আছি—কিন্তু জয় পরাজয় উভয়েরই সম্ভাবনা। জয় হইলে আমার নূতন কিছু লাভ হইবে না। কিন্তু পরাজয়ে সর্বস্বহানি। কিন্তু, আপনাদিগের সহিত সন্ধি করিয়া রাজ্যগ্রহণ করিলে সে আশঙ্কা থাকিবে না।

বিশেষতঃ সর্বদা যুদ্ধোত্তম থাকিতে হইলে নূতন রাজ্য
সুশাসিত হয় না ।

ম। আপনি রাজনীতিজ্ঞের ন্যায় বিবেচনা করিয়া-
ছেন। আপনার কথাই আমার সম্পূর্ণ প্রত্যয় জন্মিল।
আমিও এইরূপ স্পষ্ট করিয়া খিলিজি সাহেবের অভিপ্রায়
ব্যক্ত করি। তিনি এক্ষণে অনেক চিন্তায় ব্যস্ত আছেন
যথার্থ, কিন্তু হিন্দুস্থানে যবনরাজ একেশ্বর হইবেন, অন্য
রাজার নামমাত্র আমরা রাখিব না। কিন্তু আপনাকে
গোড়ে শাসনকর্তা করিব। যেমন দিল্লীতে মহম্মদ ঘোরির
প্রতিনিধি কুতবউদ্দীন, যেমন পূর্বাংশে কুতবউদ্দীনের
প্রতিনিধি বখতিয়ার খিলিজি, তেমনই গোড় আপনি
বখতিয়ারের প্রতিনিধি হইবেন। আপনি ইহাতে স্বীকৃত
আছেন কি না।

পশুপতি কহিলেন, “আমি ইহাতে সম্মত হইলাম।”

ম। ভাল; কিন্তু আমার আর এক কথা জিজ্ঞাসা
আছে। আপনি বাহা অঙ্গীকার করিতেছেন, তাহা সাধন
করিতে আপনার ক্ষমতা কি ?

প। আমার অনুমতি ব্যতীত একটা পদাতিকও
যুদ্ধ করিবে না। রাজকোষ আমার অনুচরের হস্তে।
আমার আদেশ ব্যতীত যুদ্ধের উদ্যোগে একটা কড়াও

খরচ হইবে না । পাঁচজন অমুচর লইয়া খিলিজিকে রাজপুর প্রবেশ করিতে বলিও ; কেহ জিজ্ঞাসা করিবে না “কে তোমরা ?”

ম । আরও এক কথা বাকি আছে । এই দেশে যবনের পরম শত্রু হেমচন্দ্র বাস করিতেছে । আজ রাত্রেই তাহার মুণ্ড যবন শিবিরে প্রেরণ করিতে হইবে ।

প । আপনারা আসিয়াই তাহা ছেদন করিবেন—
আমি শরণাধত-হত্যা-পাপ কেন স্বীকার করিব ?

ম । আমাদিগের হইতে হইবে না । যবন-সমাগম শুনিবামাত্র সে ব্যক্তি নগর ত্যাগ করিয়া পলাইবে । আজি সে নিশ্চিন্ত আছে । আজি লোক পাঠাইয়া তাহাকে বধ করুন ।

প । ভাল, ইহাও স্বীকার করিলাম ।

ম । আমরা সন্তুষ্ট হইলাম । আমি আপনার উত্তর লইয়া চলিলাম ।

প । যে আজ্ঞা । আর একটা কথা জিজ্ঞাস্য আছে ।

ম । কি, আজ্ঞা করুন ।

প । আমি ত রাজ্য আপনাদিগের হাতে দিব । পরে যদি আপনারা আমাকে বহিষ্কৃত করেন ?

ম । আমরা আপনার কথায় নির্ভর করিয়া অল্পমাত্র

সেনা লইয়া দূত পরিচয়ে পুরপ্রবেশ করিব। তাহাতে যদি আমরা স্বীকার মত কন্ম না করি, আপনি সহজেই আমাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন।

প। আর যদি আপনারা অল্প সেনা লইয়া না আইসেন ?

ম। তবে যুদ্ধ করিবেন। এই বলিয়া মহম্মদ আলি বিদায় হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চৌরোদ্ধরণিক।

মহম্মদ আলি বাহির হইয়া দৃষ্টিপথাতীত হইলে, অণ্ড একজন গুপ্তদ্বার-নিকটে আসিয়া মূহুরে কহিল, “প্রবেশ করিব ?”

পশুপতি কহিলেন, “কর।”

একজন চৌরোদ্ধরণিক প্রবেশ করিল। সে প্রণত হইলে পশুপতি আশীর্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন শান্তবীল ! মঙ্গল সংবাদ ত ?”

চৌরোকরগিক কহিল, “আপনি একে একে প্রশ্ন করুন—আমি ক্রমে সকল সংবাদ নিবেদন করিতেছি ।”

পশু । ষবনদিগের অবস্থিতি স্থানে গিয়াছিলে ?

শাস্ত । সেখানে কেহ যাইতে পারে না ।

পশু । কেন ?

শাস্ত । অতি নিবিড় বন, দুর্ভেদ্য ।

পশু । কুঠায় হস্তে বৃক্ষচ্ছেদন করিতে করিতে গেলে না কেন ?

শাস্ত । ব্যাঘ্র ভল্লুকের দৌরাখ্য ।

পশু । সশস্ত্রে গেলে না কেন ?

শাস্ত । যে সকল কাঠুরিয়ারা ব্যাঘ্র ভল্লুক বধ করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারা সকলেই ষবন-হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছে—কেহই ফিরিয়া আইসে নাই ।

পশু । তুমিও নাহয় না আসিতে ?

শাস্ত । তাহা হইলে কে আসিয়া আপনাকে সংবাদ দিত ?

পশুপতি হাসিয়া কহিলেন, “তুমিই আসিতে ।”

শাস্তশীল প্রশ্নাম করিয়া কহিল, “আমিই সংবাদ দিতে আসিয়াছি ।”

পশুপতি আনন্দিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি প্রকারে গেলে ?”

শাস্ত্র । প্রথমে উষ্ণীষ, অস্ত্র ও তুরকী-বেশ সংগ্রহ করিলাম । তাহা বাধিয়া পৃষ্ঠে সংস্থাপিত করিলাম । তার উপর কাঠুরিয়াদিগের সঙ্গে বন-পথে প্রবেশ করিলাম । পরে যখন যবনেরা কাঠুরিয়াদিগকে দেখিতে পাইয়া তাহাদিগকে মারিতে প্রবৃত্ত হইল—তখন আমি অপমৃত হইয়া বৃক্ষান্তুরালে বেশপরিবর্তন করিলাম । পরে মুসলমান হইয়া যবন-শিবিরে সর্বত্র বেড়াইলাম ।

পশু । প্রশংসনীয় বটে । যবন-সৈন্য কত দেখিলে ?

শাস্ত্র । সে বৃহৎ অরণ্যে বসত ধরে । বোধ হয়, পঁচিশ হাজার হইবে ।

পশুপতি ভ্র কুঞ্চিত করিয়া কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন । পরে কহিলেন, “তাহাদিগের কথাবার্তা কি শুনিলে ?”

শাস্ত্র । বিস্তর শুনিলাম—কিন্তু তাহার কিছুই আপনার নিকট নিবেদন করিতে পারিলাম না ।

পশু । কেন ?

শাস্ত্র । যাবনিক ভাষায় পণ্ডিত নহি ।

পশুপতি হাস্য করিলেন । শাস্ত্রশীল তখন কহিলেন

“মহম্মদ আলি এখানে যে আসিয়াছিলেন, তাহাতে বিপদ
আশঙ্কা করিতেছি।”

পশুপতি চমকিত হইয়া কহিলেন, “কেন ?”

শাস্ত্র । তিনি অলক্ষিত হইয়া আসিতে পারেন নাই ।
তাহার আগমন কেহ কেহ জানিতে পারিয়াছে ।

পশুপতি অত্যন্ত শঙ্কান্বিত হইয়া কহিলেন, “কিসে
জানিলে ?”

শাস্ত্রশীল কহিলেন, “আমি শ্রীচরণ দর্শনে আসিবার
সময় দেখিলাম যে বৃক্ষতলে এক ব্যক্তি লুক্কায়িত হইল ।
তাহার যুদ্ধের সাজ । তাহার সঙ্গে কথোপকথনে বুঝি-
লাম যে, সে মহম্মদ আলিকে এ পুরীতে প্রবেশ করিতে
দেখিয়া তাহার জন্ত প্রতীক্ষা করিতেছে, অন্ধকারে
তাহাকে চিনিতে পারিলাম না ।”

পশু । তার পর ?

শাস্ত্র । তার পর দাস তাহাকে চিত্রগৃহে কারারুদ্ধ
করিয়া রাখিয়া আসিয়াছে ।

পশুপতি চৌরোদ্ধরণিককে সাধুবাদ করিতে লাগিলেন ;
এবং কহিলেন, “কাল প্রাতে উঠিয়া সে ব্যক্তির প্রতি
বিহিত করা যাইবেক । আজি, রাত্ৰিতে সে কারারুদ্ধই
থাক । এক্ষণে তোমাকে অন্য এক কার্য সাধন

করিতে হইবে ! যবনসেনাপতির ইচ্ছা অন্য রাত্ৰিতে তিনি মগধরাজপুত্রের চিত্র মস্তক দর্শন করেন । তাহা এখনই সংগ্রহ করিবে ।

শাস্ত্র । কাৰ্য্য নিতান্ত সহজ নহে । রাজপুল পিপড়ে মাছি নন ।

পশু । আমি তোমাকে একা সঙ্গে যাইতে বলিতেছি না । কতকগুলি লোক লইয়া তাঁহার বাড়ী আক্রমণ করিবে ।

শাস্ত্র । লোকে কি বলবে ?

পশু । লোকে বলবে দক্ষুতে তাঁহাকে মারিয়া গিয়াছে ।

শাস্ত্র । যে আত্মা, আমি চলিলাম ?

পশুপতি শাস্ত্রীকে পুরস্কার দিয়া বিদায় করিলেন । পরে গৃহাভ্যন্তরে যথা বিচিত্র মৃগ্ন কারুকার্য্যখচিত মন্দিরে অষ্টভুজামূর্তি স্থাপিত আছে, তথায় গমন করিয়া প্রাতিমাত্রণে মাষ্ট্রীয়ে প্রণাম করিলেন । গাত্ৰোত্থান করিয়া যত্নকরে ভক্তিভাবে ইষ্টদেবীর স্তুতি করিয়া কহিলেন, “জননি ! বিশ্বপালিনি । আমি অকুল সাগরে কাঁপ দিলাম— দেখিও মা ! আমার উদ্ধার করিও । আমি জননী-স্বরূপা জন্মভূমি কখন দেবদেবী যবনকে বিক্রয় করিব

না । কেবলমাত্র এই আমার পাপাভিসন্ধি যে, অক্ষয়
প্রাচীন রাজার স্থানে আমি রাজা হইব । যেমন কণ্টকের
দ্বারা কণ্টক উদ্ধার করিয়া পরে উভয় কণ্টককে দূরে
কোণিয়া দেয়, তেমনি যবন-সহায়তায় রাজ্যলাভ করিয়া
রাজা-সহায়তার যবনকে নিপাত করিব । ইহাতে পাপ
কি মা ? যদি ইহাতে পাপ হয়, যাবজ্জীবন প্রজার
স্বাধীন্য করিয়া সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব । হুগৎ-
প্রার্থিনি ! প্রসন্ন হইয়া আমার কামনা সিদ্ধ কর ।”

এই বলিয়া পশুপতি পুনরপি মাষ্ট্রাজে প্রণাম করি-
লেন । প্রণাম করিয়া গাভ্রোথান করিলেন—শয্যাগৃহে
যাহবার জন্ত ফিরিয়া দেখিলেন—অপূর্ব দর্শন—

সম্মুখে দ্বারদেশ ব্যাপ্ত করিয়া, জীবনময়ী প্রতিমাক্রিপণা
তরুণী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ।

পশুপতি প্রথমে চমকিত হইলেন—শিহরিয়া
উঠিলেন । পরক্ষণেই উচ্ছ্বানোগ্রুথ সমুদ্রবারিষৎ আনন্দে
ক্ষীত হইলেন ।

তরুণী বাগানিন্দিত স্বরে কহিলেন, “পশুপতি ।”

পশুপতি দেখিলেন—মনোরমা !



অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

—

মোহিনী ।

সেই রত্নপ্রদোপদীপ্ত দেবীমন্দিরে, চন্দ্রালোকবিভাসিত
 দ্বারদেশে, মনোরমাকে দেখিয়া, পশুপতির হৃদয়
 উচ্ছ্বাসোন্মুখ সমুদ্রের ত্যার স্ফীত হইয়া উঠিল। মনো-
 রমা নিতান্ত ধর্ষাকৃতি নহে, তবে তাঁহাকে বালিকা
 বলিয়া বোধ হইত, তাহার হেতু এই যে, মুখকান্তি
 অনির্কচনায় কোমল, অনির্কচনীয় মধুর, নিতান্ত বালিকা
 বয়সের শুদার্থ্যবিশিষ্ট; সুতরাং হেমচন্দ্র যে তাঁহার পঞ্চদশ
 বৎসর বয়ঃক্রম অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা অগ্রাস্য হয়
 নাই। মনোরমার বয়ঃক্রম যথার্থ পঞ্চদশ কি ষোড়শ
 কি তদধিক, কি তন্নূন, তাহা ইতিহাসে লেখেনা।
 পাঠক মহাশয় স্বয়ং সিদ্ধান্ত করিবেন।

মনোরমার বয়স যতই হউক না কেন, তাহার রূপ-
 রাশি অতুল—চক্ষুতে ধরে না। বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে,
 সর্বকালে সে রূপরাশি দুর্লভ। একে বর্ণ সোণার চাঁপা,
 তাহাতে ভূজঙ্গশিশুশ্রেণীর ত্যার কুঞ্চিত অলকশ্রেণী মুখ-

খানি বেড়িয়া থাকে ; এক্ষণে বাপীজলসিঞ্চনে সে কেশ ঋজু হইয়াছে ; অর্ধচন্দ্রাকৃত নির্মল ললাট, ভ্রমর-ভর-স্পন্দিত নীলপুষ্পতুল্য কৃষ্ণতার, চঞ্চল, লোচনযুগল ; মুহুমুহুঃ আকুঞ্চন-বিস্ফারণ-প্রবৃত্ত ঝঙ্কন-সুগঠন নাসা ; অধরৌষ্ঠ যেন প্রাতঃশিশিরে সিক্ত, প্রাতঃসূর্যের কিরণে প্রোক্তির রক্তকুসুমাবলীর সুরযুগল তুল্য ; কপোল যেন চন্দ্রকরোচ্ছল, নিতান্ত স্থির, গঙ্গাধুবিস্তারবৎ প্রসন্ন ; শাবকহিংসা-শঙ্কায় উদ্বেজিতা হংসীর স্তায় গ্রীবা,—বেণী বাধিলেও সে গ্রীবার উপরে অবদ্ধ ক্ষুদ্র কুঞ্চিত কেশ সকল আসিয়া কেলি করে । দ্বিরদ-রদ যদি কুসুমকোমল হইত, কিংবা চন্দ্রক যদি গঠনোপযোগী কাঠিন্য পাইত, কিংবা চন্দ্রকিরণ যদি শরীরবিশিষ্ট হইত, তবে তাহাতে সে বাহুযুগল গড়িতে পারা যাইত,—সে হৃদয় কেবল সেই হৃদয়েই গড়া যাইতে পারিত । এ সকলই অশ্রু স্কন্দরীর আছে ; মনোরমার রূপরাশি অতুল কেবল তাঁহার সর্বাঙ্গীণ সৌকুমার্যের জন্ত । তাঁহার বদন সুকুমার ; অধর, ক্রযুগ, ললাট সুকুমার ; সুকুমার কপোল ; সুকুমার কেশ । অলকাবলী যে ভূজঙ্গশিশুরূপী সেও সুকুমার ভূজঙ্গশিশু । গ্রীবার, গ্রীবাতঙ্গীতে, সৌকুমার্য ; বাহুতে, বাহুর প্রক্ষেপে, সৌকুমার্য ; হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে সেই

সৌকুমার্য্য ; সুকুমার চরণ, চরণখিত্রাস সুকুমার ।
 গমন সুকুমারি, বসন্তবায়ুসঞ্চালিত কুম্মিত লতার মলা-
 দোলন তুল্য ; বচন সুকুমার, নিশীথ সময়ে জলরাশি
 পার হইতে সমাগত বিরহ-সঙ্গীত তুল্য ; কটাক্ষ সুকুমার,
 কণমাত্র জন্ত মেঘমালাযুক্ত সুধাংশুর কিরণসম্পাত তুল্য ;
 আর ঐ যে মনোরমা দেবীগৃহদ্বারদেশে দাঁড়াইয়া
 আছেন,—পশুপতির মুখাবলোকন জন্ত উন্নতমুখী,
 নরনতারা উর্দ্ধস্থাপনস্পন্দিত, আর বাপীজলার্জ, আবদ্ধ
 কেশরাশির কিরণংশ এক হস্তে ধরিয়া, এক চরণ ঈষন্মাত্র
 অগ্রাবর্ত্তী করিয়া, যে ভঙ্গীতে মনোরমা দাঁড়াইয়া আছে,
 শু ভঙ্গীও সুকুমার ; নবীন সূর্য্যোদয়ে সত্বঃ প্রফুল্লদলমালা-
 যয়ী নলিনীর প্রসন্ন ব্রীড়াতুল্য সুকুমার । সেই মাধুর্য্যময়
 দেহের উপর দেবীপার্বস্থিত রত্নদীপের আলোক পতিত
 হইল । পশুপতি অতৃপ্তমননে দেখিতে লাগিলেন ।

নবম পরিচ্ছেদ ।

মোহিতা ।

পশুপতি অতৃপ্তনয়নে দেখিতে লাগিলেন । দেখিতে দেখিতে মনোরমার সৌন্দর্য্য-সাগরের এক অপূর্ব মহিমা দেখিতে পাইলেন । যেমন সূর্য্যের প্রথর করণালীর হাশুময় অশুরাশি মেঘসঞ্চারে ক্রমে ক্রমে গম্ভীর কৃষ্ণকান্তি প্রাপ্ত হয়, তেমনই পশুপতি দেখিতে দেখিতে মনোরমার সৌকুমার্য্যময় মুখমণ্ডল গম্ভীর হইতে লাগিল । আর সে বাণিকাসুলভ ঔনার্য্যব্যঞ্জক ভাব রহিল না । অপূর্ব তেজোভাব্যক্তির সহিত, অগলভ বয়সেরও দুর্লভ গাভীর্য্য তাহাতে বিরাজ করিতে লাগিল । সরলতাকে ঢাকিয়া প্রতিভা উদ্ভিত হইল । পশুপতি কহিলেন, “মনোরমা, এত রাত্রিতে কেন আসিয়াছ ?—এ কি ? আজি তোমার এ ভাব কেন ?”

মনোরমা উত্তর করিলেন, “আমার কি ভাব দেখিলে ?”

প। তোমার ছই মূর্তি—এক মূর্তি স্মারনময়ী, সরলা
বাণিকা—সে মূর্তিতে কেন আসিলে না ?—সেইরূপে
আমার হৃদয় শীতল হয়। আর তোমার এই মূর্তি-গষ্ঠীরা
তেজস্বিনী প্রতিভাময়ী প্রথরবুদ্ধিশালিনী—এ মূর্তি দেখিলে
আমি ভীত হই। তখন বুঝিতে পারি যে, তুমি কোন
দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছ। আজ তুমি এ মূর্তিতে আমাকে
ভয় দেখাইতে কেন আসিয়াছ ?

ম। পশুপতি, তুমি এত রাত্রি জাগরণ করিয়া কি
করিতেছ ?

প। আমি রাজকার্যে ব্যস্ত ছিলাম—কিন্তু তুমি—

ম। পশুপতি, আবার ? রাজকার্যে না নিজকাৰ্যে ?

প। নিজকাৰ্য্যই বল। রাজকার্যেই হউক, আর নিজ
কাৰ্যেই হউক, আমি কবে না ব্যস্ত থাকি ? তুমি আজ
জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন ?

ম। আমি সকল শুনিয়াছি।

প। কি শুনিয়াছ ?

ম। যবনের সঙ্গে পশুপতির মন্ত্রণা—শাস্ত্রশীলের
সঙ্গে মন্ত্রণা—দ্বারের পার্শ্বে থাকিয়া সকল শুনিয়াছি।

পশুপতির মুখমণ্ডল যেন মেঘাঙ্ককারে ব্যাপ্ত হইল।
তিনি বহুক্ষণ চিন্তামগ্ন থাকিয়া কহিলেন,

“ভালই হইরাছে। সকল কথাই আমি তোমাকে বলিতাম—না হর তুমি আগে শুনিয়াছ। তুমি কোন কথা না জান?”

ম। পশুপতি, তুমি আমাকে ত্যাগ করিলে?

প। কেন, মনোরমা? তোমার জন্যই আমি এ মন্ত্রণা করিয়াছি। আমি এক্ষণে রাজভৃত্য, ইচ্ছামত কার্য করিতে পারি না। এখন বিধবাবিবাহ করিলে জনসমাজে পরিত্যক্ত হইব; কিন্তু যখন আমি স্বয়ং রাজা হইব, তখন কে আমার ত্যাগ করিবে? যেমন বলাগঙ্গেন কোলীণ্ডের নূতন পদ্ধতি প্রচলিত করিয়াছিলেন, আমি সেইরূপ বিধবাপরিণয়ের নূতন পদ্ধতি প্রচলিত করিব।

মনোরমা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, “পশুপতি, সে সকল আমার স্বপ্নমাত্র। তুমি রাজা হইলে, আমার সে স্বপ্ন ভঙ্গ হইবে। আমি কখনও তোমার মহিষী হইব না।”

প। কেন মনোরমা?

ম। কেন? তুমি রাজ্যভার গ্রহণ করিলে আর কি আমার ভালবাসিবে? রাজ্যই তোমার হৃদয়ে প্রধান স্থান পাইবে!—তখন আমার প্রতি তোমার অনাদর

হইবে। তুমি যদি ভাল না বাসিলে—তবে আমি কেন তোমার পত্নীত্ব-শৃঙ্খলে বাধা পড়িব ?

প। এ কথা কে কেন মনে স্থান দিতেছ। আগে তুমি—পরে রাজ্য। আমার চিরকাল এইরূপ থাকিবে।

ম। রাজ্য হইয়া যদি তাহা কর, রাজ্য অপেক্ষা মহিষী যদি অধিক ভালবাস, তবে তুমি রাজ্য করিতে পারিবে না ! তুমি রাজ্যচ্যুত হইবে। স্ত্রী রাজার রাজ্য থাকে না।

পশুপতি প্রশংসমান লোচনে মনোরমার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন ; কহিলেন, “যাহার বামে এমন সরস্বতী, তাহার আশঙ্কা কি ? না হয় তাহাই হউক। তোমার ক্রম রাজ্য ত্যাগ করিব।”

ম। তবে রাজ্য গ্রহণ করিতেছ কেন ? ত্যাগের ক্রম গ্রহণে ফল কি ?

প। তোমার পাণিগ্রহণ।

ম। সে আশা ত্যাগ কর। তুমি রাজ্যলাভ করিলে আমি কখনও তোমার পত্নী হইব না।

প। কেন, মনোরমা ! আমি কি অপরাধ করিলাম ?

ম। তুমি বিশ্বাসঘাতক—আমি বিশ্বাসঘাতককে কি প্রকারে ভক্তি করিব ? কি প্রকারে বিশ্বাসঘাতককে ভালবাসিব ?

প। কেন, আমি কিসে বিশ্বাসঘাতক হইলাম ?

ম। তোমার প্রতিপালক প্রভুকে রাজ্যচ্যুত করিবার কল্পনা করিতেছ ; শরণাগত রাজপুত্রকে মারিবার কল্পনা করিতেছ ; ইহা কি বিশ্বাসঘাতকের কৰ্ম্ম নয় ? যে প্রভুর নিকট বিশ্বাস নষ্ট করিল, সে স্ত্রীর নিকট অশ্রদ্ধাসী না হইবে কেন ?

পশুপতি নীরব হইয়া রহিলেন । মনোরমা পুনরপি বলিতে লাগিলেন, “পশুপতি, আমি মিনতি করিতেছি, এই দুৰ্গন্ধি ত্যাগ কর ।”

পশুপতি পূৰ্ব্ববৎ অধোবদনে রহিলেন, তাঁহার রাজ্য-কাজ্জনা এবং মনোরমাকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা উভয়ই গুরুতর । কিন্তু রাজ্যলাভের যত্ন করিলে মনোরমার প্রণয় হারাইতে হয় সেও অত্যাঙ্গ । উভয় সঙ্কটে তাঁহার চিন্তামধ্যে গুরুতর চাঞ্চল্য জন্মিল । তাঁহার মতির স্থিরতা দূর হইতে লাগিল । “যদি মনোরমাকেই পাই, ভিক্ষাও ভাল, রাজ্যে কাজ কি ?” এইরূপ পুনঃপুনঃ মনে ইচ্ছা হইতে লাগিল । কিন্তু তখনই আবার ভাবিতে লাগিলেন, “কিন্তু তাহা হইলে লোকনিন্দা, জনসমাজে কলঙ্ক, জাতিনাশ হইবে ; সকলের ঘৃণিত হইব । তাহা কি

প্রকারে সহিব ?” পশুপতি নীরবে রহিলেন ; কোন উত্তর দিতে পারিলেন না ।

মনোরমা উত্তর না পাইয়া কহিতে লাগিল, “শুন পশুপতি, তুমি আমার কথায় উত্তর দিলে না । আমি চলিলাম । কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে ইহ জন্মে আমার সাক্ষাৎ হইবে না ।”

এই বলিয়া মনোরমা পশ্চাৎ ফিরিল । পশুপতি, রোদন করিয়া উঠিলেন ।

অমনই মনোরমা আবার ফিরিল । আসিয়া, পশুপতির হস্তধারণ করিল । পশুপতি তাঁহার মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন । দেখিলেন, তেজোগর্ভবিশিষ্টা, কুণ্ডিতক্রবীচিবিক্ষেপকারিণী সরস্বতী মূর্তি আর নাই ; সে প্রতিভাদেবী অস্তর্ধান হইয়াছেন ; কুসুমকুমারী বালিকা তাঁহার হস্তধারণ করিয়া তাঁহার সঙ্গে রোদন করিতেছে ।

“মনোরমা কহিলেন, “পশুপতি, কাঁদিতেছ কেন ?”

পশুপতি চকুর জল মুছিয়া কহিলেন, “তোমার কথায় ।”

ম । কেন, আমি কি বলিয়াছি ?

প । তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছিলে ।

ম। আর আমি এমন করিব না।

প। তুমি আমার রাজমহিষী হইবে ?

ম। হইব।

পশুপতির আনন্দসাগর উছলিয়া উঠিল। উভয়ে অশ্রুপূর্ণ লোচনে উভয়ের মুখপ্রতি চাহিয়া উপবেশন করিয়া রহিলেন। সহসা মনোরমা পক্ষিণীর স্তায় গাত্রো-
খান করিয়া চলিয়া গেলেন।

দশম পরিচ্ছেদ ।

ফাঁদ ।

পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, বাপীতীর হইতে হেম-
চন্দ্র মনোরমার অনুবর্তী হইয়া যবন-সম্মানে আসিতে-
ছিলেন। মনোরমা ধর্ম্মাধিকারের গৃহ কিছু দূরে
থাকিতে হেমচন্দ্রকে কহিলেন, “সম্মুখে এই অট্টালিকা
দেখিতেছ ?”

হেম। দেখিতেছি।

মনো। ঐখানে যবন প্রবেশ করিয়াছে।

হেম । কেন ?

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া মনোরমা কহিলেন, “তুমি এইখানে গাছের আড়ালে থাক । যখনকে এই স্থান দিয়া যাইতে হইবে ।”

হেম । তুমি কোথায় যাইবে ?

মনো । আমিও এই বাড়ীতে যাইব ।

হেমচন্দ্র স্বাক্ষত হইলেন । মনোরমার আচরণ দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন । তাহার পরামর্শানুসারে পথিপার্শ্বে বৃক্ষান্তরালে লুকায়িত হইয়া রহিলেন । মনোরমা শুপ্তপথে অলক্ষ্যে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন ।

এই সময়ে শান্তনীল পশুপতির গৃহে আসিতেছিল । সে দেখিল যে, এক ব্যক্তি বৃক্ষান্তরালে লুকায়িত হইল । শান্তনীল সন্দেহ প্রযুক্ত সেই বৃক্ষতলে গেল । তথায় হেমচন্দ্রকে দেখিয়া প্রথমে চোর অনুমানে কহিল, “কে তুমি ? এখানে কি করিতেছ ? পরে তৎক্ষণে হেমচন্দ্রের বহুমূল্যের অলঙ্কারশোভিত যোদ্ধবশ দেখিয়া কহিল, “আপনি কে ?”

হেমচন্দ্র কহিলেন, “আমি যে হই না কেন ?”

শা । আপনি এখানে কি করিতেছেন ?

হে । আমি এখানে বসনাগ্নসন্ধান করিতেছি ।

শান্তনীর চমকিত হইয়া কহিল, “যবন কোথায় ?”

হে । এই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে ।

শান্তনীর ভীত ব্যক্তির গায় স্বরে কহিল, “এ গৃহে
কেন ?”

হে । তাহা আমি জানি না ।

শা । এ গৃহ কাহার ?

হে । তাহা জানি না ।

শা । তবে আপনি কি প্রকারে জানিলেন যে এই
গৃহে যবন প্রবেশ করিয়াছে ?

হে । তা তোমার শুনিয়া কি হইবে ?

শা । এ গৃহ আমার । যদি যবন ইহাতে প্রবেশ
করিয়া থাকে, তবে কোন অনিষ্টকামনা করিয়া গিয়াছে,
সন্দেহ নাই । আপনি যোদ্ধা এবং যবনদেষ্টা দেখিতেছি ।
যদি ইচ্ছা থাকে, তবে আমার সঙ্গে আসুন—উভয়ে
চোরকে ধৃত করিব ।

হেমচন্দ্র সঙ্গত হইয়া শান্তনীর সঙ্গে চলিলেন ।
শান্তনীর সিংহদ্বার দিয়া পশুপতির গৃহে হেমচন্দ্রকে
লইয়া প্রবেশ করিলেন এবং এক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া
কহিলেন, “এই গৃহমধ্যে আমার সুবর্ণ রত্নাদি সকল
আছে, আপনি ইহার গ্রহণ করুন । আমি

ততক্ষণ সন্ধান করিয়া আসি, কোন্ স্থানে যবন লুকায়িত আছে ।”

এই কথা বলিয়াই শাস্ত্রশীল সেই কক্ষ হইতে নিজ্জানিত হইলেন । এবং হেমচন্দ্র কোন উত্তর দিতে না দিতেই বাহির দিকে কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিলেন । হেমচন্দ্র ফাঁদে পড়িয়া বন্দী হইয়া রহিলেন ।

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

মুক্ত ।

মনোরমা পশুপতির নিকট বিদায় হইয়াই দ্রুতপদে চিত্রগৃহে আসিল । পশুপতির সহিত শাস্ত্রশীলের কথোপকথন সময়ে শুনিয়াছিল যে, ঐ ঘরে হেমচন্দ্র রুদ্ধ হইয়াছিলেন । আসিয়াই চিত্রগৃহের দ্বারোন্মোচন করিল । হেমচন্দ্রকে কহিল, “হেমচন্দ্র, বাহির হইয়া যাও ।”

হেমচন্দ্র গৃহের বাহিরে আসিলেন । মনোরমা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিল । তখন হেমচন্দ্র মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

“আমি রুদ্ধ হইয়াছিলাম কেন ?”

- ম। তাহা পরে বলিব ।
- হে। যে ব্যক্তি আমাকে রুদ্ধ করিয়াছিল, সে কে ?
- ম। শাস্ত্রশীল ।
- হে। শাস্ত্রশীল কে ?
- ম। চৌরোদ্ধরগিক ।
- হে। এই কি তাহার বাড়ী ?
- ম। না ।
- হে। এ, কাহার বাড়ী ?
- ম। পরে বলিব ।
- হে। যখন কোথায় গেল ?
- ম। শিবিরে গিয়াছে ।
- হে। শিবির ! কত যখন আসিতেছে ?
- ম। পঁচিশ হাজার ।
- হে। কোথায় তাহাদের শিবির ?
- ম। মহাবনে ।
- হে। মহাবন কোথায় ?
- ম। এই নগরের উত্তরে কিছু দূরে ।
- হেমচন্দ্র করলক্ষকপোল হইয়া ভাবিতে লাগিলেন ।
- মনোরমা কহিল, “ভাবিতেছ, কেন ? তুমি কি তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে ?”

হে। পঁচিশ হাজারের সঙ্গে একের যুদ্ধ সম্ভবে ?

ম। তবে কি করিবে—ঘরে ফিরিয়া যাইবে ?

হে। এখন ঘরে যাব না।

ম। কোথা যাবে ?

হে। মহাবনে।

ম। যুদ্ধ করিবে না, তবে মহাবনে যাইবে কেন ?

হে। যখনদিগকে দেখিতে।

ম। যুদ্ধ করিবে না, তবে দেখিয়া কি হুইবে ?

হে। দেখিলে জানিতে পারিব, কি উপায়ে তাহা-
দিগকে মারিতে পারিব !

মনোরমা চমকিয়া উঠিলেন। কহিলেন, “বিশ হাজার
মানুষ মারিবে ? কি সর্বনাশ ! ছি ! ছি !

হে। মনোরমা, তুমি এ সকল সংবাদ কোথায়
পাইলে ?

ম। আরও সংবাদ আছে। আজি রাত্রিতে তোমাকে
মারিবার জন্ত তোমার ঘরে দস্যু আসিবে। আজি ঘরে
যাইও না।

এই বলিয়া মনোরমা উদ্ধ্বাসে পলায়ন করিল।



দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অতিথি-সংকার ।

হেমচন্দ্র গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া এক সুন্দর অশ্ব সজ্জিত করিয়া তত্পরি আরোহণ করিলেন ; এবং অশ্ব কশাঘাত করিয়া মহাবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন । নগর পার হইলেন ; তৎপরে প্রান্তর । প্রান্তরেরও কিয়দংশ পার হইলেন, এমন সময়ে অকস্মাৎ স্কন্ধদেশে গুরুতর বেদনা পাইলেন । দেখিলেন স্কন্ধে একটা তীর বিদ্ধ হইয়াছে । পশ্চাতে অশ্বের পদধ্বনি শ্রুত হইল । ফিরিয়া দেখিলেন, তিনজন অশ্বারোহী আসিতেছে ।

হেমচন্দ্র ঘোটকের মুখ ফিরাইয়া তাহাদিগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । ফিরিবামাত্র দেখিলেন, প্রত্যেক অশ্বারোহী তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এক এক শরসন্ধান করিল । হেমচন্দ্র বিচিত্র শিক্ষাকৌশলে করত শূলান্দোলন দ্বারা তীরত্রয়ের আঘাত এককালে নিবারণ করিলেন ।

অশ্বারোহিগণ পুনর্বার একেবারে শরসংযোগ করিল ।

এবং তাহা নিবারণিত হইতে না হইতেই পুনর্বার শরত্ৰয় ত্যাগ করিল।

এইরূপ অবিরতহস্তে হেমচন্দ্রের উপর বাণক্ষেপ করিতে লাগিল। হেমচন্দ্র তখন বিচিত্র রত্নাদিমণ্ডিত চর্ম্ম হস্তে লইলেন, এবং তৎসঞ্চালন দ্বারা অবলীলাক্রমে সেই শরজাল ধ্বংস নিরাকরণ করিতে লাগিলেন; কদাচিৎ ছুট এক শর অশ্বশরীরে বিদ্ধ হইল মাত্র। স্বয়ং অক্ষত রহিলেন।

বিস্মিত হইয়া অশ্বারোহিত্রয় নিরস্ত হইল। পরস্পরে কি পরামর্শ করিতে লাগিল। হেমচন্দ্র সেই অবকাশে একজনের প্রতি এক শরত্যাগ করিলেন। সে অব্যর্থ সন্ধান। শর, একজন অশ্বারোহীর ললাটমধ্যে বিদ্ধ হইল। সে অমনি অশ্বপৃষ্ঠচ্যুত হইয়া ধরাতলশায়িত হইল।

তৎক্রমাৎ অপর দুই জনে অশ্ব কশাঘাত করিয়া শূল-যুগল প্রণত করিয়া হেমচন্দ্রের প্রতি ধাবমান হইল। এবং শূলক্ষেপযোগ্য নৈকটা প্রাপ্ত হইলে শূলক্ষেপ করিল। যদি তাহারা হেমচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া শূল ত্যাগ করিত, তবে হেমচন্দ্রের বিচিত্র শিকায় তাহা নিবারণিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তাহা না করিয়া আক্রমণকারীরা হেমচন্দ্রের অশ্ব প্রতি লক্ষ্য করিয়া শূলত্যাগ করিয়াছিল।

ততদূর অধঃপর্যাস্ত হস্তসঞ্চালনে হেমচন্দ্রের বিলম্ব হইল। একের শূল নিবারিত হইল, অপরের নিবারিত হইল না। শূল অশ্বের গ্রীবাতে বিদ্ধ হইল। সেই আঘাত প্রাপ্তিমাত্র সেই রমণীর ঘোটক মুমূর্ষু হইয়া ভূতলে পড়িল।

সুশিক্ষিতের ন্যায় হেমচন্দ্র পতনশীল অশ্ব হইতে লক্ষ্য দিয়া ভূতলে দাঁড়াইলেন। এবং পলকমধ্যে নিজ করস্ব করাল শূল উন্নত করিয়া কহিলেন, “আমার পিতৃদত্ত শূল শক্ররক্ত পান না করিয়া কখন ফেরে নাই।” তাহার এই কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে তদগ্রে বিদ্ধ হইয়া দ্বিতীয় অশ্বারোহী ভূতলে পতিত হইল।

ইহা দেখিয়া তৃতীয় অশ্বারোহী অশ্বের মুখ ফিরাইয়া বেগে পলায়ন করিল। সেই শাস্তশীল।

হেমচন্দ্র তখন অবকাশ পাইয়া নিজ স্কন্ধবিদ্ধ তীর মোচন করিলেন। তীর কিছু অধিক মাংসভেদ করিয়াছিল—মোচন মাত্র অতিশয় শোণিতক্ষতি হইতে লাগিল। হেমচন্দ্র নিজ বস্ত্র দ্বারা তাহার নিবারণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহা নিষ্ফল হইল। ক্রমে হেমচন্দ্র রক্তক্ষতি হেতু দুর্বল হইতে লাগিলেন। তখন বুঝিলেন যে, বন-শিবিরে গমনের অস্ত্র-আর কোন সম্ভাবনা নাই। অশ্ব হত হইয়াছে—সিদ্ধবল হত হই-

তেছে। অতএব অপ্রসন্ন মনে, ধীরে ধীরে, নগরান্তিমুখে প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলেন।

হেমচন্দ্র প্রান্তর পার হইলেন। তখন শরীর নিতান্ত অবশ হইয়া আসিল—শোণিতস্রোতে সর্বাঙ্গ আর্দ্র হইল ; গতিশক্তিহীন হইয়া আসিতে লাগিল। কণ্ঠে নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। . . আর যাইতে পারেন না। এক কুটারের নিকট বটবৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। তখন রজনী প্রভাত হইয়াছে। রাত্রিজাগরণ—সমস্ত রাত্রির পরিশ্রম—রক্তস্রাবে বলহানি—এই সকল কারণে হেমচন্দ্রের চক্ষুতে পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল। তিনি বৃক্ষমূলে পৃষ্ঠ বন্ধা করিলেন। চক্ষু মুদ্রিত হইল—নিদ্রা প্রবল হইল—চেতনা অপহৃত হইল। নিদ্রাবেশে স্বপ্নে যেন শুনিলেন, কে গায়িতেছে,

“কণ্ঠকে গঠিল বিধি সুগাল অধমে।”



তৃতীয় খণ্ড ।





তৃতীয় খণ্ড ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

“উনি তোমার কে ?”

যে কুটারের নিকটস্থ বৃক্ষতলে বসিয়া হেমচন্দ্র বিশ্রাম করিতেছিলেন, সেই কুটারমধ্যে এক পাটনীর বাস করিত্ত্ব । কুটারমধ্যে তিনটি ঘর । এক ঘরে পাটনীর পাকাদি সমাপন হইত । অপর ঘরে পাটনীর পত্নী শিশুসন্তান সকল লইয়া শয়ন করিত । তৃতীয় ঘরে পাটনীর যুবতী কন্যা রত্নময়ী আর অপর দুইটি স্ত্রীলোক শয়ন করিয়াছিল । সেই দুইটি স্ত্রীলোক, পাঠক মহাশয়ের নিকট পরিচিতা ;

মৃগালিনী আর গিরিজারা নবদ্বীপে অন্তত আশ্রয় না পাইয়া
এই স্থানে আশ্রয় লইয়াছিলেন ।

একে একে তিনটি দ্বীলোক প্রভাতে জাগরিতা
হইল । প্রথমে রত্নময়ী জাগিল । গিরিজারাকে সম্বোধন
করিয়া কহিল,

“সই ?”

গি । কি সই ?

র । তুমি কোথায় সই ?

গি । বিছানাসই ।

র । উঠ না সই !

গি । না সই ।

র । গায়ে জল দিব সই ।

গি । জলসই ? ভাল সই, তাও সই ।

র । নহিলে ছাড়ি কই ।

গি । ছাড়িবে কেন সই ? তুমি আমার প্রাণের
সই—তোমার মত আছে কই ? তুমি পারঘাটার রসমই—
তোমায় না কইলে আর কারে কই ?

র । কথায় সই তুমি চিরজই ; আমি তোমার কাছে
বোঝা হই, আর মিলাইতে পারি কই ?

গি । আরও মিল চাই ?

র। তোমার মুখে ছাই, আর মিলে কাজ নাই,
আমি কাজে যাই।

এই বলিয়া রত্নময়ী গৃহকর্মে গেল। মৃগালিনী এ
পর্যন্ত কোন কথা কহেন নাই। এখন গিরিজারা
তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল,

“ঠাকুরাণি, জাগিয়াছ ?”

মৃগালিনী কহিলেন, “জাগিয়াই আছি। জাগিয়াই
থাকি।”

গি। কি ভাবিতেছিলে ?

মৃ। যাহা ভাবি।

গিরিজারা তখন গম্ভীরভাবে কহিল, “কি করিব ?
আমার দোষ নাই। আমি শুনিয়াছি তিনি এই
নগরমধ্যে আছেন ; এ পর্যন্ত সন্ধান পাই নাই। কিন্তু
আমরা ত সবে দুই তিন দিন আসিয়াছি। শীঘ্র সন্ধান
করিব।”

মৃ। গিরিজারা, যদি এ নগরে সন্ধান না পাই ?
তবে যে এই পাটনীর গৃহে মৃত্যু পর্যন্ত বাস করিতে
হইবে। আমার যে যাইবার স্থান নাই।

মৃগালিনী উপাধানে মুখ লুকাইলেন। গিরিজারারও
গণ্ডে নীরবকৃত অশ্রু বহিতে লাগিল।

এমন সময়ে রক্তময়ী শশব্যস্তে গৃহমধ্যে আসিয়া কহিল, “সই! সই! দেখিয়া যাও। আমাদের বটতলায় কে ঘুমাইতেছে। আশ্চর্য্য পুরুষ!”

গিরিজায়া। কুটীরদ্বারে দেখিতে আসিল। মৃগালিনীও কুটীরদ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া দেখিলেন। উভয়েই দৃষ্টিমাত্র চিনিল।

সাগর একেবারে উছলিয়া উঠিল। মৃগালিনী গিরিজায়াকে আলিঙ্গন করিলেন। গিরিজায়া গায়িল,

“কণ্টকে গঠিল বিধি মৃগাল অধমে।”

সেই ধ্বনি স্বপ্নবৎ হেমচন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। মৃগালিনী গিরিজায়ার কণ্ঠকণ্ঠরন দেখিয়া কহিলেন,

“চুপ, রাক্ষসী, আমাদিগের দেখা দেওয়া হইবে না, তুই উনি জাগরিত হইতেছেন। এই অন্তরাল হইতে দেখ, উনি কি করেন। উনি যেখানে যান, অদৃশ্যভাবে দূরে থাকিয়া উঁহার সঙ্গে যাও।—এ কি! উঁহার অঙ্গ রক্তময় দেখিতেছি কেন? চল, তবে আমিও সঙ্গে চলিলাম।”

হেমচন্দ্রের ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল। প্রাতঃকাল উপস্থিত

দেখিয়া তিনি শূলদণ্ডে ভর করিয়া গাজোথান করিলেন,
এবং ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে চলিলেন ।

হেমচন্দ্র কিয়দূর গেলে, মৃগালিনী আর গিরিজারা
তঁাহার অন্তঃসরণার্থ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইলেন । তখন
ব্রহ্মময়ী জিজ্ঞাসা করিল,

“ঠাকুরাণি, উনি তোমার কে ?”

মৃগালিনী কহিলেন, “দেবতা জানেন ।”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

প্রতিজ্ঞা—পর্বতো বহুমান্ ।

বিশ্রাম করিয়া হেমচন্দ্র কিঞ্চিৎ সবল হইয়াছিলেন ।
শোণিতস্রাবও কতক মন্দীভূত হইয়াছিল । শূলে ভর
করিয়া হেমচন্দ্র স্বচ্ছন্দে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন ।

গৃহে আসিয়া দেখিলেন, মনোরমা স্বয়ম্বেশে দাঁড়াইয়া
আছেন ।

মৃগালিনী ও গিরিজারা অন্তরালে থাকিয়া মনো-
রমাকে দেখিলেন ।

মনোরমা চিত্রাঙ্কিত পুস্তালিকার স্তম্ভ দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেখিয়া মৃগালিনী মনে মনে ভাবিলেন, “আমার প্রভু যদি রূপে বশীভূত হয়েন, তবে আমার সুখের নিশি প্রভাত হইয়াছে।” গিরিজায়া ভাবিল, “রাজপুত্র যদি রূপে মুগ্ধ হয়েন, তবে আমার ঠাকুরাণীর কপাল ভাঙ্গিয়াছে ?”

হেমচন্দ্র মনোরমার নিকট আসিয়া কহিলেন, “মনোরমা—এমন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছ কেন ?”

মনোরমা কোন কথা কহিলেন না। হেমচন্দ্র পুনরপি ডাকিলেন, “মনোরমা !”

তথাপি উত্তর নাই ; হেমচন্দ্র দেখিলেন আকাশমার্গে স্তম্ভের স্থিরদৃষ্টি স্থাপিত হইয়াছে।

হেমচন্দ্র পুনরায় বলিলেন, “মনোরমা, কি হইয়াছে ?”

তখন মনোরমা ধীরে ধীরে আকাশ হইতে চক্ষু ফিরাইয়া হেমচন্দ্রের মুখমণ্ডলে স্থাপিত করিল। এবং কিয়ৎকাল অনিমেষ লোচনে তৎপ্রতি চাহিয়া রহিল। পরে হেমচন্দ্রের কধিরাক্ত পরিচ্ছদে দৃষ্টিপাত হইল। তখন মনোরমা বিস্মিত হইয়া কহিল,

“এ কি হেমচন্দ্র ! রক্ত কেন ? তোমার মুখ শুষ্ক ; তুমি কি আহত হইয়াছ ?”

হেমচন্দ্র অঙ্গুলি দ্বারা স্বক্কের কৃত দেখাইয়া দিলেন ।

মনোরমা তখন হেমচন্দ্রের হস্ত ধারণ করিয়া গৃহমধ্যে পালঙ্কোপরি লইয়া গেল । এবং পলকমধ্যে বারিপূর্ণ ভঙ্গার আনীত করিয়া, একে একে হেমচন্দ্রের গাত্রব্যসন পরিত্যক্ত করাইয়া অঙ্গের ক্রধির সকল ধৌত করিল । এবং গোজাতিপ্রলোভন নবজুর্কানল ভূমি হইতে ছিন্ন করিয়া আপন কুন্দনিন্দিত দস্তে চর্কিত করিল । পরে তাহা ক্রতমুখে প্রয়োগ করিয়া উপবীতাকারে বস্ত্র দ্বারা বাধিল । তখন কহিল,

“হেমচন্দ্র ! আর কি করিব ? তুমি সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়াছ, নিদ্রা যাইবে ?”

হেমচন্দ্র কহিলেন, “নিদ্রাভাবে নিতান্ত কাতর হইতেছি ।”

মৃগালিনী মনোরমার কাৰ্য্য দেখিয়া চিন্তিতান্তঃকরণে গিরিজায়াকে করিলেন, “এ কে গিরিজায়া ?”

গি । নাম শুনিলাম মনোরমা ।

মৃ । এ কি হেমচন্দ্রের মনোরমা ?

গি । তুমি কি বিবেচনা করিতেছ ?

মৃ । আমি ভাবিতেছি, মনোরমাই ভাগ্যবতী । আমি হেমচন্দ্রের সেবা করিতে পারিলাম না, সে করিল ।

বে কার্যের জন্য আমার অন্তঃকরণ দগ্ধ হইতেছিল—
মনোরমা সে কার্য সম্পন্ন করিল—দেবতার উহাকে
আবুগতী করুন। গিরিজায়া, আমি গৃহে চলিলাম,
আমার আর থাকি উচিত নহে। তুমি এই পল্লীতে থাক,
হেমচন্দ্র কেমন থাকেন সংবাদ লইয়া যাইও। মনোরমা
যেই হউক, হেমচন্দ্র আমারই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

হেতু—ধূমাৎ ।

মনোরমা এবং হেমচন্দ্র গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে স্বর্ণ-
ালিনীকে বিদায় দিয়া গিরিজায়া উপবন গৃহ প্রদক্ষিণ
করিতে লাগিলেন। যেখানে-যেখানে বাতায়ন-পথ মুক্ত
দেখিলেন, সেইখানে সাবধানে মুখ উন্নত করিয়া
গৃহমধ্যে দৃষ্টিপাত করিলেন। এক কক্ষ হেমচন্দ্রকে
শয়নাবস্থায় দেখিতে পাইলেন; দেখিলেন তাঁহার
শয্যাপরি মনোরমা বসিয়া আছে। গিরিজায়া সেই
বাতায়ন-তলে উপবেশন করিলেন। পূর্বরাত্রে সেই
বাতায়ন-পথে যখন হেমচন্দ্রকে দেখা দিয়াছিল।

বাতায়ন-তলে উপবেশনে গিরিজায়ার অভিপ্রায় এই ছিল যে, হেমচন্দ্র মনোরমার কি কথোপকথন হয়, তাহা বিবলে থাকিয়া শ্রবণ করে । কিন্তু হেমচন্দ্র নিদ্রাগত, কোন কথোপকথনই ত হয় না । একাকী নীরবে' সেই বাতায়ন-তলে বসিয়া গিরিজায়ার বড়ই কষ্ট হইল । কথা কহিতে পার না, হাসিতে পার না, বাঙ্গ করিতে পার না, বড়ই কষ্ট—ক্রীরসনা কণ্ঠস্থিত হইয়া উঠিল । মনে মনে ভাবিতে লাগিল—সেই পাগিষ্ঠ দিগ্বিজয়ই বা কোথায় ? তাহাকে পাইলেও ত মুখ খুলিয়া বাঁচি । কিন্তু দিগ্বিজয় গৃহমধ্যে প্রভুর কার্যে নিযুক্ত ছিল—তাহারও সাক্ষাৎ পাইল না । তখন অন্য পাত্রাভাবে গিরিজায়া আপনার সহিত মনে মনে কথোপকথন আরম্ভ করিল । সে কথোপকথন শুনিতে পাঠক মহাশয়ের কোতূহল জন্মিয়া থাকিলে, প্রশ্নোত্তর-চ্ছলে তাহা জানাইতে পারি । গিরিজায়াই প্রশ্নকর্ত্রী, গিরিজায়াই উত্তরদাত্রী ।

প্র । ওলো ! তুই বসিয়া কে লো ?

উ । গিরিজায়া লো ।

প্র । এখানে কেন লো ?

উ । মৃগালিনীর অন্ত্রে লো ।

প্র । মৃগালিনী তোর কে ?

উ। কেউ না।

প্র। তবে তার জন্তে তোর এত মাথা ব্যথা কেন ?

উ। আমার আর কাজ কি ? বেড়াইয়া বেড়াইয়া কি করিব ?

প্র। মৃগালিনীর জন্তে এখানে কেন ?

উ। এখানে তার একটা শিকলীকাটা পাখী আছে।

প্র। পাখী ধরিয়া নিয়ে যাবি না কি ?

উ। শিকলী কেটে থাকে ত ধরিয়া কি করিব ?
ধরিবই বা কিরূপে ?

প্র। তবে বসিয়া কেন ?

উ। দেখি শিকল কেটেছে কি না।

প্র। কেটেছে না কেটেছে জেনে কি হইবে ?

উ। পাখিটার জন্তে মৃগালিনী প্রতিরাত্রে কত
লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে—আজি না জানি কতই কাঁদবে।
যদি ভাল সংবাদ লইয়া যাই, তবে অনেক রক্ষা হইবে।

প্র। আর যদি শিকল কেটে থাকে ?

উ। মৃগালিনীকে বলিব যে, পাখী হাতছাড়া
হয়েছে—রাধাকৃষ্ণ নাম শুনিবে ত আবার বনের পাখী
ধরিয়া আন। পড়া পাখীর আশা ছাড়। পিঁজরা খালি
রাখিও না।

প্র। মর্ ভিখারীর মেয়ে ! তুই আপনার মনের মত কথা বলিলি ! যুগালিনী যদি রাগ করিয়া পিঁজরা ভাঙ্গিয়া ফেলে ?

উ। ঠিক বলেছি সই ! তা সে পারে । বলা হবে না ।

প্র। তবে এখানে বসিয়া রোদ্রে পুড়িয়া মরিস্ কেন ?

উ। বড় মাথা ধরিয়াছে তাই । এই যে মেয়েটা ঘরের ভিতর বসিয়া আছে—এ মেয়েটা বোবা—নহিলে এখনও কথা কয় না কেন ? মেয়েমানুষের মুখ এখনও বন্ধ ?

ক্লেপক পরে গিরিজায়ার মনস্কাম সিদ্ধ হইল । হেম-চন্দ্রের নিদ্রাভঙ্গ হইল । তখন মনোরমা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

“কেমন, তোমার ঘুম হয়েছে ?”

হে। বেশ ঘুম হয়েছে ।

ম। এখন বল কি প্রকারে আঘাত পাইলে ?

তখন হেমচন্দ্র রাত্রির ঘটনা সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন । শুনিয়া মনোরমা চিন্তা করিতে লাগিল ।

হেমচন্দ্র কহিলেন, “তোমার জিজ্ঞাস্তা শেষ হইল । এখন আমার কথার উত্তর দাও । কালি রাত্রিতে তুমি আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া গেলে যাহা যাহা ঘটয়াছিল, সকল বল ।”

মনোরমা মৃহ মৃহ অক্ষুটস্বরে কি বলিল। গিরিজা তাহা শুনিতে পাইল না। বুঝিল চুপি চুপি কি কথা হইল।

গিরিজা 'আর কোন কথা শুনিতে না পাইয়া গাত্রোথান করিল। তখন পুনর্বার প্রশ্নোত্তরমালা মনোমধ্যে গ্রথিত হইতে লাগিল।

প্র। কি "বুঝিলে ?

উ। কয়েকটা লক্ষণ মাত্র।

প্র। কি কি লক্ষণ ?

গিরিজা অশ্লীলিতে গণিতে লাগিল, এক—
মেরেটা আশ্চর্য সুন্দরী; আগুনের কাছে ঘি কি গাঢ়
থাকে ? দুই—মনোরমা ত হেমচন্দ্রকে ভালবাসে, নহিলে
এত যত্ন করিল কেন ? তিন—একত্র বাস। চারি—
একত্রে রাত বেড়ান। পাঁচ—চুপি চুপি কথা।

প্র। মনোরমা ভালবাসে; হেমচন্দ্রের কি ?

উ। বাতাস না থাকিলে কি জলে ঢেউ হয় ?
আমাকে যদি কেহ ভালবাসে, আমি তাহাকে ভাল-
বাসিব সন্দেহ নাই।

প্র। কিন্তু মৃগালিনীও ত হেমচন্দ্রকে ভালবাসে।
তবে ত হেমচন্দ্র মৃগালিনীকে ভালবাসিবেই।

উ । যথার্থ । কিন্তু মৃগালিনী অল্পস্থিত, মনোরমা উপস্থিত ।

এই ভাবিয়া গিরিজায়া ধীরে ধীরে গৃহের দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইল । তথায় একটা গীত 'আরম্ভ করিয়া কহিল,

“ভিক্ষা দাও গো ।”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৷

উপনয়—বহুব্যাপ্যো ধূমবান্ ৷

গিরিজায়া গীত গায়িল,

“কাহে সহ জীরত মরত কি বিধান ?

ব্রজকি কিশোর সহ, কাহা গেল ভাগই,
জজন টুটায়ল পরাণ ।”

সঙ্গীতধ্বনি হেমচন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিল । স্বপ্নশ্রুত শব্দের শ্রাব কর্ণে প্রবেশ করিল ।

গিরিজায়া আবার গায়িল,

“ব্রজকি কিশোর নই, কাঁহা গেল ভাগই,
ব্রজবধু টুটায়ল পরাণ ।”

হেমচন্দ্র উন্মুখ হইয়া শুনিতে লাগিলেন ।
গিরিজায়া আবার গায়িল,

“মিলি গেই নাগরী, ভুলি গেই মাধব,
রূপবিহীন গোপকুণ্ডারী ।
কো জানে পিয় সই, রসময় প্রেমিক,
হেন বঁধু রূপকি ভিথারী ॥”

হেমচন্দ্র কহিলেন, “এ কি ! মনোরমা, এ বে গিরি-
জায়ার স্বর ! আমি চলিলাম ।” এই বলিয়া লক্ষ্য দিয়া
হেমচন্দ্র শয্যা হইতে অবতরণ করিলেন । গিরিজায়া
গায়িতে লাগিল,

“আগে নাহি বুঝনু, রূপ দেখি ভুলনু,
হৃদি বৈনু চরণ যুগল ।
যমুনা-সলিলে সই, অব তনু ডারব,
আন সখি ভবিব গরল ॥”

হেমচন্দ্র গিরিজায়ার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন । ব্যস্ত
স্বরে কহিলেন,

“গিরিজায়া ! এ কি, গিরিজায়া ! তুমি এখানে ?
তুমি এখানে কেন ? তুমি এদেশে কবে আসিলে ?”

গিরিজায়া কহিল, “আমি, এখানে অনেক দিন আসিয়াছি ।” এই বলিয়া আবার গায়িতে লাগিল,

“কিবা কাননবল্লরী, গল বেচি বাধই,
নবীন তমালে দিব কাঁস ।”

হেমচন্দ্র কহিলেন, “তুমি এ দেশে কেন এলে ?”

গিরিজায়া কহিল, “ভিক্ষা আমার উপজীবিকা ।
রাজধানীতে অধিক ভিক্ষা পাইব বলিয়া আসিয়াছি—

“কিবা কাননবল্লরী, গল বেচি বাধই,
নবীন তমালে দিব কাঁস ।”

হেমচন্দ্র গীতে কর্ণপাত না করিয়া কহিলেন, “মৃগালিনী
কেমন আছে ; দেখিয়া আসিয়াছ ?”

গিরিজায়া গায়িতে লাগিল,

“নহে—শ্রাম শ্রাম শ্রাম শ্রাম, শ্রাম নাম জপরি,
ছার তনু করব কিনাশ ।”

হেমচন্দ্র কহিলেন, “তোমার গীত রাখ । আমার
কথার উত্তর দাও ! মৃগালিনী কেমন আছে, দেখিয়া
আসিয়াছ ?”

গিরিজায়া কহিল, “মৃগালিনীকে আমি দেখিয়া আসি
নাই । এ গীত আপনার ভাল না লাগে, অন্য গীত
গাইতেছি ।”

“এ জনমের সঙ্গে কি সই জনমের সাধ ফুরাইবে ।
কিংবা জন্ম জন্মাস্তরে, এ সাধ মোর পুরাইবে ॥”

হেমচন্দ্র কহিলেন, “গিরিজায়া, তোমাকে মিনতি
করিতেছি গান রাখ, মৃগালিনীর সংবাদ বল ।”

গি। কি বলিব ?

হে। মৃগালিনীকে কেন দেখিয়া আইস নাই ?

গি। গোড়নগরে তিনি নাই ।

হে। কেন ? কোথায় গিয়াছেন ?

গি। মথুরায় ।

হে। মথুরায় ? মথুরায় কাহার সঙ্গে গেলেন ? কি
প্রকারে গেলেন ? কেন গেলেন ?

গি। তাঁহার পিতা কি প্রকারে সন্ধান পাইয়া লোক
পাঠাইয়া লইয়া গিয়াছেন । বুঝি তাঁহার বিবাহ উপস্থিত ।
বুঝি বিবাহ দিতে লইয়া গিয়াছেন ।

হে। কি ? কি করিতে ?

গি। মৃগালিনীর বিবাহ দিতে তাঁহার পিতা তাঁহাকে
লইয়া গিয়াছেন ।

হেমচন্দ্র মুখ ফিরাইলেন । গিরিজায়া সে মুখ দেখিতে
পাইল না ; আর যে হেমচন্দ্রের স্বকণ্ঠ কতমুখ ছুটিয়া

বন্ধনবস্ত্র রক্তে প্লাবিত হইতেছিল; তাহাও দেখিতে পাইল না । সে পূর্বমত গায়িল,

“বিধি তোরে সাধি শুন, জন্ম যদি দিবে পুন,
আমারে আবার যেন, রমণী-জনম দিবে ।
লাজ ভয় তেরাগিব, এ সাধ মোর পুরাইব,
সাগর ছেঁচে রতন নিব, কণ্ঠে রাখিব নিশি দিবে ।”

হেমচন্দ্র মুখ ফিরাইলেন । বলিলেন, “গিরিজায়্য,
তোমার সংবাদ শুভ । উত্তম হইয়াছে ।”

এই বলিয়া হেমচন্দ্র গৃহমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন । গিরিজায়্যার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল । গিরিজায়্যা মনে করিয়াছিল, মিছা করিয়া যুগালিনীর বিবাহের কথা বলিয়া সে হেমচন্দ্রের পরীক্ষা করিয়া দেখিবে । মনে করিয়াছিল যে যুগালিনীর বিবাহ উপস্থিত হইয়া হেমচন্দ্র বড় কাতর হইবে, বড় রাগ করিবে । কৈ তা ত কিছুই হইল না । তখন গিরিজায়্যা কপালে করাখাত করিয়া ভাবিল, “হায় কি করিলাম ! কেন অনর্থক এ মিথ্যা রটনা করিলাম ! হেমচন্দ্র ত সুখী হইল দেখিতেছি—বলিয়া গেল—সংবাদ শুভ । এখন ঠাকুরাণীর দশা কি হইবে ?” হেমচন্দ্র যে কেন গিরিজায়্যাকে বলিলেন, তোমার সংবাদ শুভ, তাহা, গিরিজায়্যা তিথারিণী বৈ

ত নয়—কি বুঝবে? যে ক্রোধভরে হেমচন্দ্র এই যুগালিনীর জন্ত শুরুদেবের প্রতি শরসন্ধানে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, সেই দুর্জয় ক্রোধ হৃদয়মধ্যে সমুদিত হইল। অভিমানাধিক্যে, দুর্দম ক্রোধাবেগে, হেমচন্দ্র গিরিজায়াকে বলিলেন, “তোমার সংবাদ শুভ!”

গিরিজায়া তাহা বুঝিতে পারিল না। মনে করিল এই বৃষ্টি লক্ষণ। কেহ তাহাকে ভিক্ষা দিল না; সেও ভিক্ষার প্রতীক্ষা করিল না; “শিকলী কাটায়াছে” সিদ্ধান্ত করিয়া গৃহাভিমুখে চলিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আর একটা সংবাদ।

সেই দিন মাধবাচার্য্যের পর্য্যটন সমাপ্ত হইল। তিনি নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। তথায় প্রিয় শিষ্য হেমচন্দ্রকে দর্শনদান করিয়া চরিতার্থ করিলেন। এবং আশীর্ব্বাদ, আলিঙ্গন, কুশলপ্রশ্নাদির পরে বিরলে উভয়ের উদ্দেশ্য সাধনের কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

আপন ভ্রমগযুক্তান্ত সন্নিহিত বিবৃত করিয়া মাধবা-

চার্য্য কহিলেন, “এত শ্রম করিয়া কতকদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি । এতদেশে অধীন রাজগণের মধ্যে অনেকেই রণক্ষেত্রে সৈন্তে সেন রাজার সহায়তা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন । অচিরে সকলে আসিয়া নব্বীপে সমবেত হইবেন ।”

হেমচন্দ্র কহিলেন, “তাঁহারা অদ্যই এস্থলে না আসিলে সকলই বিফল হইবে । যবন-সেনা আসিয়াছে, মহাবনে অবস্থিতি করিতেছে । আজি কালি নগর আক্রমণ করিবে ।”

মাধবাচার্য্য শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন । কহিলেন, “গোড়েশ্বরের পক্ষ হইতে কি উদ্যম হইয়াছে ?”

হে । কিছুই না । বোধ হয় রাজসন্নিধানে এ সংবাদ এ পর্য্যন্ত প্রচার হয় নাই । আমি দৈবাৎ কালি এ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি ।

মা । এ বিষয় তুমি রাজগোচর করিয়া সৎপরামর্শ দাও নাই কেন ?

হে । সংবাদপ্রাপ্তির পরেই পথিমধ্যে দস্যু কর্তৃক আহত হইয়া রাজপথে পড়িয়াছিলাম । এই মাত্র গৃহে আসিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতেছি । বলহানি প্রযুক্ত রাজসমক্ষে ঘাইতে পারি নাই । এখনই ঘাইতেছি ।

মা । তুমি এখন বিশ্বাস কর । আমি রাজার নিকট যাইতেছি । পশ্চাৎ বেরূপ হয় তোমাকে জানাইব । এই বলিয়া মাধবাচার্য্য গাত্রোথান করিলেন ।

তখন হেমচন্দ্র বলিলেন, “প্রভু ! আপনি গোড় পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন শুনিলাম—”

মাধবাচার্য্য অভিপ্রায় বুঝিয়া কহিলেন, “গিয়াছিলাম । তুমি মৃগালিনীর সংবাদ কামনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছ ? মৃগালিনী তথায় নাই ।”

হে । কোথায় গিয়াছে ?

মা । তাহা আমি অবগত নহি, কেহ সংবাদ দিতে পারিল না ।

হে । কেন গিয়াছে ?

মা । বৎস ! সে সকল পরিচয় যুদ্ধান্তে দিব ।

হেমচন্দ্র ক্রকুটী করিয়া কহিলেন, “স্বরূপ বৃত্তান্ত আমাকে জানাইলে, আমি যে মর্শ্বপীড়ার কাতর হইব, সে আশঙ্কা করিবেন না । আমিও কিয়দংশ শ্রবণ করিয়াছি । যাহা অবগত আছেন, তাহা নিঃসঙ্কোচে আমার নিকট প্রকাশ করুন ।”

মাধবাচার্য্য গোড়নগরে গমন করিলে দ্ব্যকেশ তাঁহাকে আপন জ্ঞানমত মৃগালিনীর বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিয়া-

ছিলেন । তাহাই প্রকৃত বৃত্তান্ত বলিয়া মাধবাচার্য্যেরও বোধ হইয়াছিল ; মাধবাচার্য্য কস্মিন্‌কালে জীজ্ঞাতির অহুরাগী নহেন—সুতরাং জীচরিত্র বুঝিতেন না । এক্ষণে হেমচন্দ্রের কথা শুনিয়া তাঁহার বোধ হইল যে, হেমচন্দ্র সেই বৃত্তান্তই কতক কতক শ্রবণ করিয়া যুগালিনীর কামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন—অতএব কোন নূতন মনঃপীড়ার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া, পুনর্বার আসনগ্রহণ পূর্বক হৃদী-কেশের কথিত বিবরণ হেমচন্দ্রকে শুনাইতে লাগিলেন ।

হেমচন্দ্র অধোমুখে করতলোপরি ত্রুটুকুটিল লগাট সংস্থাপিত করিয়া নিঃশব্দে সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন । মাধবাচার্য্যের কথা সমাপ্ত হইলেও বাঙনিপ্পত্তি করিলেন না । সেই অবস্থাতেই রহিলেন । মাধবাচার্য্য ডাকিলেন, “হেমচন্দ্র !” কোন উত্তর পাইলেন না । পুনরপি ডাকিলেন, “হেমচন্দ্র !” তথাপি নিরুত্তর ।

তখন মাধবাচার্য্য গাত্রোথান করিয়া হেমচন্দ্রের হস্ত ধারণ করিলেন ; অতি কোমল, স্নেহময় স্বরে কহিলেন, “বৎস ! তাত ! মুখ তোল, আমার সঙ্গে কথা কও !”

হেমচন্দ্র মুখ তুলিলেন । মুখ দেখিয়া মাধবাচার্য্যও ভীত হইলেন । মাধবাচার্য্য কহিলেন, “আমার সহিত আগাপ কর । ক্রোধ হইয়া থাকে তাহা ব্যক্ত কর ।”

হেমচন্দ্র কহিলেন, “কাহার কথার বিশ্বাস করিব? স্ববীকেশ একরূপ কহিয়াছে। তিথারিণী আর এক প্রকার বলিল।”

মাধবাচার্য্য কহিলেন, “তিথারিণী কে? সে কি বলিয়াছে?”

হেমচন্দ্র অতি সংক্ষেপে উত্তর দিলেন।

মাধবাচার্য্য সঙ্কচিত স্বরে কহিলেন, “স্ববীকেশেরই কথা মিথ্যা বোধ হয়।”

হেমচন্দ্র কহিলেন, “স্ববীকেশের প্রত্যক্ষ।”

তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পিতৃদত্ত শূল হস্তে লইলেন। কম্পিত কলেবরে গৃহমধ্যে নিঃশব্দে পাদচারণ করিতে লাগিলেন।

আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি ভাবিতেছ?”

হেমচন্দ্র করম্ব শূল দেখাইয়া কহিলেন, “মৃগালিনীকে এই শূলে বিদ্ধ করিব।”

মাধবাচার্য্য তাঁহার মুখকান্তি দেখিয়া ভীত হইয়া অপনূত হইলেন।

প্রাতে মৃগালিনী বলিয়া শ্রবণ করিলেন, “হেমচন্দ্র আমারই।”

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

“আমি ত উম্মাদিনী ।”

অপরূহে মাধবাচার্য্য প্রত্যাঘর্ষন করিলেন। তিনি সংবাদ আনিলেন যে ধর্ম্মাধিকার প্রকাশ করিয়াছেন, যখনসেনা আদিয়াছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বজিত রাষ্ট্রে বিজ্রোহের সম্ভাবনা গুনিয়া যখনসেনাপতি সন্ধিসংস্থাপনে ইচ্ছুক হইয়াছেন। আগামী কল্য তাঁহার দূত প্রেরণ করিবেন। দূতের আগমন অপেক্ষা করিয়া কোন বুদ্ধোদ্যম হইতেছে না। এই সংবাদ দিয়া মাধবাচার্য্য কহিলেন, “এই কুলঙ্গার রাজা ধর্ম্মাধিকারের বুদ্ধিতে নষ্ট হইবে।”

কথা হেমচন্দ্রের কর্ণে প্রবেশলাভ করিল কি না সন্দেহ। তাঁহাকে বিমনা দেখিয়া মাধবাচার্য্য বিস্ময় হইলেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে মনোরমা হেমচন্দ্রের গৃহে প্রবেশ করিল। হেমচন্দ্রকে দেখিয়া মনোরমা কহিল,

“ভাই ! আজ তুমি অমন কেন ?”

হেম । কেমন আমি ?

মনো । তোমার মুখখানা শ্রাবণের আকাশের মত
অন্ধকার ; ভাদ্রমাসের গঙ্গার মত রাগে ভরা ; অত
ক্রকুটী করিতেছ কেন ? চক্ষের পলক নাই কেন—
আর দেখি—তাই ত, চোখে জল ; তুমি কেঁদেছ ?

হেমচন্দ্র মনোরমার মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন ;
আবার চক্ষু অধনত করিলেন ; পুনর্বার উন্নত গবাক্ষপথে
দৃষ্টি করিলেন ; আবার মনোরমার মুখপ্রতি চাহিয়া
রহিলেন । মনোরমা বলিল যে, দৃষ্টির এইরূপ গতির
কোন উদ্দেশ্য নাই । যখন কথা কণ্ঠাগত, অথচ বলিবার
নহে, তখনই দৃষ্টি এইরূপ হয় । মনোরমা কহিল,

“হেমচন্দ্র, তুমি কেন কাতর হইয়াছ ? কি হইয়াছে ?
হেমচন্দ্র কহিলেন, “কিছু না ।”

মনোরমা প্রথমে কিছু “বলিল না—পরে আপনা
আপনি য়্হ য়্হ কথা কহিতে লাগিল । “কিছু না—
বলিবে না ! ছি ! ছি ! বুকের ভিতর বিছা পুষিবে !”
বলিতে বলিতে মনোরমার চক্ষু দিয়া এক বিন্দু বারি
বহিল ;—পরে অকস্মাৎ হেমচন্দ্রের মুখপ্রতি চাহিয়া
কহিল, “আমাকে বলিবে না কেন ? আমি, যে তোমার
ভগিনী ।”

মনোরমার মুখের ভাবে, শান্তদৃষ্টিতে এত যত্ন, এত মৃদুতা, এত সহৃদয়তা প্রকাশ পাইল যে হেমচন্দ্রের অন্তঃকরণ দ্রবীভূত হইল। তিনি কহিলেন, “আমার যে যন্ত্রণা, তাহা ভগিনীর নিকট কখনোই নহে।”

মনোরমা কহিল, “তবে আমি ভগিনী নহি।”

হেমচন্দ্র কিছুতেই উত্তর করিলেন না। তথাপি প্রত্যাশাপন্ন হইয়া মনোরমা তাঁহার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল। কহিল,

“আমি তোমার কেহ নহি।”

হেম। আমার দুঃখ ভগিনীর অশ্রাব্য—অপরেরও অশ্রাব্য।

হেমচন্দ্রের কণ্ঠস্বর করুণাময়—নিতান্ত আধিব্যক্তি-পরিপূর্ণ; তাহা মনোরমার প্রাণের ভিতর গিয়া বাজিল। তখনই সে স্বর পরিবর্তিত হইল, নয়নে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিগন্ত হইল—অধর দংশন করিয়া হেমচন্দ্র কহিলেন, “আমার দুঃখ কি? দুঃখ কিছুই না। আমি মণি ভ্রমে কালদাপ কণ্ঠে ধরিয়াছিলাম, এখন তাহা ফেলিয়া দিয়াছি।”

মনোরমা আবার পূর্ববৎ হেমচন্দ্রের প্রতি অনিমেষ লোচনে চাহিয়া রহিল। ক্রমে তাহার মুখমণ্ডলে অতি মধুর, অতি স্কন্ধ হান্ত প্রকটিত হইল। বালিকা

প্রগল্ভতাপ্রাপ্ত হইল। সূর্য্যরশ্মির অপেক্ষা যে রশ্মি সমুজ্জ্বল, তাহার কিরীট পরিয়া প্রতিভাদেবী দেখা দিলেন। মনোরমা কহিল, “বুঝিয়াছি। তুমি না বুঝিয়া ভালবাস, তাহার পরিণাম ঘটয়াছে।”

হেম। “ভালবাসিতাম।” হেমচন্দ্র বর্তমানের পরি-
বর্ত্তে অতীতকাল ব্যবহার করিলেন। অমনি নীরবে
নিঃস্কৃত অশ্রুজলে তাঁহার মুখমণ্ডল ভাসিয়া গেল।

মনোরমা বিরক্ত হইল। বলিল, “ছি! ছি!
প্রতারণা! যে পরকে প্রতারণা করে সে বঞ্চক মাত্র।
যে আত্মপ্রতারণা করে, তাহার সর্বনাশ ঘটে।” মনো-
রমা বিরক্তিবশতঃ আপন অলকদাম চম্পকাজুলিতে জড়িত
করিয়া টানিতে লাগিল।

হেমচন্দ্র বিস্মিত হইলেন, কহিলেন, “কি প্রতারণা
করিলাম?”

মনোরমা কহিল, “ভালবাসিতাম কি? তুমি ভাল-
বাস। নহিলে কাঁদিলে কেন? কি? আজি তোমার
স্নেহের পাত্র অপরাধী হইয়াছে বলিয়া তোমার ভালবাসা
গিয়াছে? কে তোমার এমন প্রবোধ দিয়াছে?” বলিতে
বলিতে মনোরমার প্রৌঢ়তাধাপন্ন মুখকারি সহসা প্রফুল্ল
পদ্মবৎ অধিকতর ভাবব্যঞ্জক হইতে লাগিল, চক্ষু অধিক

জ্যোতিঃস্ফুরৎ হইতে লাগিল, কণ্ঠস্বর অধিকতর পরিস্ফুট,
আগ্রহকম্পিত হইতে লাগিল ; বলিতে লাগিল, “এ
কেবল বীরদম্ভকারী পুরুষদের দর্প মাত্র। অহঙ্কার
করিয়া আগুন নিবান যায় ? তুমি বালির বাধ দিয়া এই
কূলপরিপ্লাবনী গঙ্গার বেগ রোধ করিতে পারিবে, তথাপি
তুমি প্রণয়িনীকে পাপিষ্ঠা মনে করিয়া কখনও প্রণয়ের
বেগ রোধ করিতে পারিবে না। হা কৃষ্ণ ! মানুষ সক-
লেই প্রতারক !”

হেমচন্দ্র বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন, “আমি ইহাকে
এক দিন বালিকা মনে করিয়াছিলাম !”

মনোরমা কহিতে লাগিল, “তুমি পুরাণ শুনিয়াছ ?
আমি পণ্ডিতের নিকট তাহার গূঢ়ার্থ সহিত শুনিয়াছি।
লেখা আছে, ভগীরথ গঙ্গা আনিয়াছিলেন ; এক দাস্তিক
মন্ত হস্তী তাহার বেগ সংবরণ করিতে গিয়া ভাসিয়া গিয়া-
ছিল। ইহার অর্থ কি ? গঙ্গা প্রেমপ্রবাহ স্বরূপ ; ইহা
জগদীশ্বর-পাদ-পদ্ম-নিঃসৃত, ইহা জগতে পবিত্র,—যে
ইহাতে অবগাহন করে, সেই পুণ্যময় হয়। ইনি মৃত্যু-
ঞ্জয়-জটা-বিহারিণী ; যে মৃত্যুকে জয় করিতে পারে, সেও
প্রণয়কে মস্তকে ধারণ করে, আমি যেমন শুনিয়াছি,
ঠিক সেইরূপ বলিতেছি। দাস্তিক হস্তী দম্ভের অবতার

স্বরূপ, সে প্রণয়বেগে ভাসিয়া যায়। প্রণয় প্রথমে এক-
মাত্র পথ অবলম্বন করিয়া উপযুক্ত সময়ে শতমুখী হয় ;
প্রণয় স্বভাবসিদ্ধ হইলে, শতপাত্রে গুস্ত হয়—পরিশেষে
সাগরসঙ্গমে লয় প্রাপ্ত হয়—সংসারস্থ সর্বজীবে বিলীন হয়।”

হে। তোমার উপদেষ্টা কি বলিয়াছেন, প্রণয়ের
পাত্ৰাপাত্ৰ নাই ? পাপাসক্তকে কি ভালবাসিতে হইবে ?

ম। পাপাসক্তকে ভালবাসিতে হইবে। প্রণয়ের
পাত্ৰাপাত্ৰ নাই। সকলকেই ভালবাসিবে, প্রণয় জন্মি-
লেই তাহাকে যত্নে স্থান দিবে, কেন না প্রণয় অমূল্য।
ভাই, যে ভাল, তাকে কে না ভালবাসে ? যে মন্দ, তাকে
যে আপনা ভুলিয়া ভালবাসে, আমি তাকে বড় ভাল-
বাসি। কিন্তু আমি ত উন্মাদিনী।

হেমচন্দ্র বিস্মিত হইয়া কহিলেন, “মনোরমা, এ
সকল তোমার কে শিখাইল ? তোমার উপদেষ্টা
অলৌকিক ব্যক্তি।”

মনোরমা মুখাবনত করিয়া কহিলেন, “তিনি সর্ব-
জ্ঞানী, কিন্তু—”

হে। কিন্তু কি ?

ম। তিনি অগ্নিস্বরূপ—আলো করেন, কিন্তু দগ্ধও
করেন।

মনোরমা কণ্ঠে মুখাবনত করিয়া নীরব হইয়া
রহিল ।

হেমচন্দ্র বলিলেন, “মনোরমা, তোমার মুখ দেখিয়া,
আর তোমার কথা শুনিয়া, আমার বোধ হইতেছে,
তুমিও ভাল বাসিয়াছ । বোধ হয় যাহাকে তুমি অগ্নির
সহিত তুলনা করিলে তিনিই তোমার প্রণয়াদিকারী ।”

মনোরমা পূর্বমত নীরবে রহিল । হেমচন্দ্র পুনরপি
বলিতে লাগিলেন, “যদি ইহা সত্য হয়, তবে আমার
একটা কথা শুন । স্ত্রীলোকের সতীত্বের অধিক আর
ধর্ম নাই ; যে স্ত্রীর সতীত্ব নাই, সে শূকরীর অপেক্ষাও
অধম । সতীত্বের হানি কেবল কার্যোই ঘটে এমন নহে ;
স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের চিন্তামাত্রও সতীত্বের বিঘ্ন ।
তুমি বিধবা, যদি স্বামী ভিন্ন অপরকে মনেও ভাব, তবে
তুমি ইহলোকে পরলোকে স্ত্রীজাতির অধম হইয়া
থাকিবে । অতএব সাবধান হও । যদি কাহারও প্রতি
চিত্ত নিবিষ্ট থাকে, তবে তাহাকে বিশ্বস্ত হও ।”

মনোরমা উচ্চ হাস্ত করিয়া উঠিল ; পরে মুখে
অঞ্চল দিয়া হাসিতে লাগিল, হাসি বন্ধ হয় না । হেম-
চন্দ্র কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন হইলেন, কহিলেন, “হাসিতেছ
কেন ?”

মনোরমা কহিলেন, “তাই, এই গঙ্গাভীরুর গিয়া
দাঁড়াও ; গঙ্গাকে ডাকিয়া কহ, গঙ্গে, তুমি পর্বতে কির
যাও ।”

হেম । কেন ?

ম । স্থিতি কি আগন ইচ্ছাধীন ? রাজপুত্র, কাল-
সর্পকে মনে করিয়া কি স্থখ ? কিন্তু তথাপি তুমি তাহাকে
কুলিতেছ না কেন ?

হে । তাহার দংশনের আশঙ্কা ।

ম । আর সে যদি দংশন না করিত ? তবে কি
তাহাকে কুলিতে ?

হেমচন্দ্র উত্তর করিলেন না । মনোরমা বলিতে
লাগিল, “তোমার কুলের মালা কালসাপ হইয়াছে, তবু
তুমি কুলিতে পারিতেছ না ; আমি, আমি ত পাগল
—আমি আমার পুষ্পহার কেন ছিঁড়িব ?”

হেমচন্দ্র কহিলেন, “তুমি এক প্রকার অন্ধার বলিতেছ
না । বিস্থিতি ইচ্ছাধীন ক্রিয়া নহে ; লোক আশ্বগয়িমার
অঙ্ক হইয়া পরের প্রতি যে সকল উপদেশ করে, তন্মধ্যে
‘বিস্থিত হও’ এই উপদেশের অপেক্ষা হস্তাঙ্গাদ আর
কিছুই নাই । কেহ কাহাকে বলে না, অর্থচিন্তা ছাড় ;
যশের ইচ্ছা ছাড় ; জ্ঞানচিন্তা ছাড় ; কুখানিবার ইচ্ছা

ত্যাগ কর ; তুফানিবারণেচ্ছা ত্যাগ কর ; নিজা ছাড় ; তবে কেন বলিবে, ভালবাসা ছাড় ? ভালবাসা কি এ সকল অপেক্ষা ছোট ? এ সকল অপেক্ষা প্রণয় ন্যূন নহে—কিন্তু ধর্মের অপেক্ষা ন্যূন বটে ! ধর্মের জন্ত প্রেমকে সংহার করিবে । জীর পরম ধর্ম সতীত্ব । সেই জন্ত বলিতেছি, যদি পার, প্রেম সংহার কর ।”

ম। আমি অবলা ; জ্ঞানহীনা ; বিবশা ; আমি ধর্মধর্ম কাহাকে বলে, তাহা জানি না । আমি এইমাত্র জানি, ধর্ম ভিন্ন প্রেম জন্মে না ।

হে । সাবধান, মনোরমা ! বাসনা হইতে ভ্রান্তি জন্মে ; ভ্রান্তি হইতে অধর্ম জন্মে । তোমার ভ্রান্তি পর্য্যন্ত হইয়াছে । তুমি বিবেচনা করিয়া বল দেখি, তুমি যদি ধর্মের একের পত্নী, মনে অশ্রের পত্নী হইলে, তবে তুমি দ্বিচারিণী হইলে কি না ?

গৃহমধ্যে হেমচন্দ্রের অসিচর্ম বুঝিতেছিল ; মনোরমা চর্ম হস্তে লইয়া কহিল, “ভাই, হেমচন্দ্র, তোমার এ ভাল কিসের চামড়া ?”

হেমচন্দ্র হাত কব্জিলেন । মনোরমার মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন, বলিলেন ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গিরিজায়ার সংবাদ।

গিরিজায়া যখন পাটনীর গৃহে প্রত্যাবর্তন করে, তখন প্রাণাঙ্কে হেমচন্দ্রের নবানুরাগের কথা সুগামিনীর সাক্ষাতে ব্যক্ত করিবে না স্থির করিয়াছিল। সুগামিনী তাহার আগমন প্রতীক্ষায় পিঞ্জরে বদ্ধ বিহঙ্গীর স্তায় চঞ্চলা হইয়া রহিয়াছিলেন; গিরিজায়াকে দেখিবামাত্র কহিলেন, “বল গিরিজায়া, কি দেখিলে? হেমচন্দ্র কেমন আছেন?”

গিরিজায়া কহিল, “ভাল আছেন।”

সু। কেন, অমন কন্দিয়া বলিলে কেন? তোমার কথায় উৎসাহ নাই কেন? যেন হুঃখিত হইয়া বলিতেছ; কেন?

গি। সে কি?

সু। গিরিজায়া, আমাকে প্রতারণা করিও না; হেমচন্দ্র কি ভাল করেন নাই, তাহা হইলে আমাকে স্পষ্ট করিয়া বল। সন্দেহের অপেক্ষা প্রতীতি ভাল।

গিরিজায়া এরার সহাস্ত্রে কহিল, “তুমি কেন অনর্থক ব্যস্ত হও। আমি নিশ্চিত বলিতেছি তাঁহার শরীরে কিছুই ক্লেশ নাই। তিনি উঠিয়া বেড়াইতেছেন।”

মৃগালিনী ক্রণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন, “মনোরমার সহিত তাঁহার কোন কথাবার্তা শুনিলে?”

গি। শুনিলাম।

মৃ। কি শুনিলে?

গিরিজায়া তখন হেমচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন তাহা কহিলেন। কেবল হেমচন্দ্রের সঙ্গে যে মনোরমা নিশা পর্যটন করিয়াছিলেন ও কাণে কাণে কথা বলিয়াছিলেন এই দুইটা বিষয় গোপন করিলেন। মৃগালিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি হেমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছ?”

গিরিজায়া কিছু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, “করিয়াছি।”

মৃ। তিনি কি কহিলেন?

গি। তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

মৃ। তুমি কি বলিলে?

গি। আমি বলিলাম, তুমি ভাল আছ।

মৃ। আমি এখানে আসিয়াছি, তাহা বলিয়াছ?

গি। না।

মৃ। গিরিজায়া, তুমি ইতস্ততঃ করিয়া উত্তর দিতেছ

তোমার মুখ শুকন। তুমি আমার মুখপানে চাহিতে পারিতেছ না; আমি নিশ্চিত বুঝিতেছি, তুমি কোন অমঙ্গল সংবাদ আমার নিকট লুকাইতেছ। আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। যাহা থাকে অদৃষ্টে, আমি স্বপ্নং হেমচন্দ্রকে দেখিতে যাইব। পার আমার সঙ্গে আইস, নচেৎ আমি একাকিনী যাইব।

এই বলিয়া মৃগালিনী অবশুণ্ঠনে মুখাবৃত করিয়া বেগে রাজপথ অতিবাহন করিয়া চলিলেন।

গিরিজারা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিতা হইল। কিছুদূর আসিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া কহিল, “ঠাকুরানি! ফের; আমি যাহা লুকাইয়াছি, তাহা প্রকাশ করিতেছি।”

মৃগালিনী গিরিজারার সঙ্গে সঙ্গে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তখন গিরিজারা যাহা যাহা গোপন করিয়াছিল, তাহা সবিস্তারে প্রকাশিত করিল।

গিরিজারা হেমচন্দ্রকে ঠকাইয়াছিল। কিন্তু মৃগালিনীকে ঠকাইতে পারিল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

মৃগালিনীর লিপি ।

মৃগালিনী কহিলেন, “গিরিজায়া, তিনি রাগ করিয়া বলিয়া থাকিবেন, ‘উত্তম হইয়াছে’ ; ইহা শুনিয়া তিনি কেনই বা রাগ না করিবেন ?”

গিরিজায়ারও তখন সংশয় জন্মিল । সে কহিল, “ইহা সম্ভব বটে ।”

তখন মৃগালিনী কহিলেন, “তুমি এ কথা বলিয়া ভাল কর নাই । এর বিহিত করা উচিত ; তুমি আহালাদি করিতে যাও । আমি ততক্ষণ একখানি পত্র লিখিয়া রাখিব । তুমি খাইবার পর, সেইখানি লইয়া তাঁহার নিকটে যাইবে ।”

গিরিজায়া স্বীকৃতা হইয়া সত্বর আহালাদির জন্ত গমন করিল । মৃগালিনী সংক্ষেপে পত্র লিখিলেন ।

লিখিলেন,

“গিরিজারা মিথ্যাবাদিনী । যে কারণে সে তোমার নিকট মৎসঙ্গকে মিথ্যা বলিয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে, সে স্বয়ং বিস্তারিত করিয়া কহিবে । আমি মথুরায় যাই নাই । যে রাত্ৰিতে তোমার অঙ্গুরীয় দেখিয়া যমুনাতটে আসিয়াছিলাম, সেই রাত্ৰি অবধি আমার পক্ষে মথুরার পথ রুদ্ধ হইয়াছে । আমি মথুরায় না গিয়া তোমাকে দেখিতে নবদ্বীপে আসিয়াছি । নবদ্বীপে আসিয়াও যে এ পর্য্যন্ত তোমার সহিত সাক্ষাৎ করি নাই, তাহার এক কারণ এই, আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তোমার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হইবে । আমার অভিলাষ তোমাকে দেখিব, তৎসিদ্ধিপক্ষে তোমাকে দেখা দেওয়ার আবশ্যক কি ?”

গিরিজারা এই লিপি লইয়া পুনরপি হেমচন্দ্রের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল । সন্ধ্যাকালে, মনোরমার সহিত কথোপকথন সমাপ্তির পরে, হেমচন্দ্র গঙ্গাদর্শনে যাইতেছিলেন, পথে গিরিজারার সহিত সাক্ষাৎ হইল । গিরিজারা তাঁহার হস্তে লিপি দিল ।

হেমচন্দ্র কহিলেন, “তুমি আবার কেন ?”

গি । পত্র লইয়া আসিয়াছি ।

হে । পত্র কাহার ?

গি । যুগালিনীর পত্র ।

হেমচন্দ্র বিস্মিত হইলেন, “এ পত্র কি প্রকারে তোমার নিকট আসিল ?”

গি। স্বর্ণালিনী নবদ্বীপে আছেন। আমি মথুরায় কথা আপনার নিকট মিথ্যা বলিয়াছি।

হে। এই পত্র তাঁহার ?

গি। হাঁ তাঁহার স্বহস্তলিখিত।

হেমচন্দ্র লিপিখানি না পড়িয়া তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিন্ন ভিন্ন করিলেন। ছিন্ন খণ্ড সকল বনমধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া কহিলেন,

“তুমি যে মিথ্যাবাদিনী, তাহা আমি ইতিপূর্বেই গুণিতে পাইয়াছি। তুমি যে ছুষ্ঠার পত্র লইয়া আসিয়াছ সে যে বিবাহ করিতে যায় নাই, স্রষ্টাকেশ তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে, তাহা আমি ইতিপূর্বেই গুণিয়াছি। আমি কুলটার পত্র পড়িব, না। তুই আমার সম্মুখ হইতে দূর হ।”

গিরিজায়া চমৎকৃত হইয়া নিকটরে হেমচন্দ্রের মুখ পানে চাহিয়া রহিল।

হেমচন্দ্র পথিপার্শ্বস্থ এক ক্ষুদ্র বৃক্ষের শাখা ভগ্ন করিয়া হস্তে লইয়া কহিলেন, “দূর হ, নচেৎ বেত্রাঘাত করিব।”

গিরিজার আর সহ হইল না। ধীরে ধীরে বলিল, “বীর পুরুষ বটে! এই রকম বীরত্ব প্রকাশ করিতে বুঝি নদীরায় এসেছ? কিছু প্রয়োজন ছিল না—এ বীরত্ব মগধে বসিয়াও দেখাইতে পারিতে! মুসলমানের জুতা বহিতে, আর গরিব দুঃখীর মেয়ে দেখিলে বেত মারিতে।”

হেমচন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া বেত ফেলিয়া দিলেন। কিন্তু গিরিজার রাগ গেল না। বলিল, “তুমি মৃগালিনীকে বিবাহ করিবে? মৃগালিনী দূরে থাক, তুমি আমারও যোগ্য নও।”

এই বলিয়া গিরিজা, সদর্পে গজেন্দ্রগমনে চলিয়া গেল। হেমচন্দ্র ভিখারিণীর গর্ভ দেখিয়া অবাক হইয়া রহিলেন।

গিরিজা প্রত্যাগতা হইয়া হেমচন্দ্রের আচরণ মৃগালিনীর নিকট সবিশেষ বিবৃত করিল। এবার কিছু লুকাইল না। মৃগালিনী ভনিয়া কোন উত্তর করিলেন না। রোদনও করিলেন না। যেরূপ অবস্থায় শ্রবণ করিতেছিলেন, সেইরূপ অবস্থাতেই রহিলেন। দেখিয়া গিরিজা শঙ্কান্বিত হইল—তখন মৃগালিনীর কথোপকথনের সময় নহে বুঝিয়া তথা হইতে সরিয়া গেল।

পাটনীর গৃহের অনতিদূরে যে এক সোপানবিশিষ্ট পুষ্করিণী ছিল, তথায় গিয়া 'গিরিজায়া সোপানোপরি উপবেশন করিল। শারদীয়া পূর্ণিমার প্রদীপ্ত কৌমুদীতে পুষ্করিণীর স্বচ্ছ নীলাবু অধিকতর নীলোজ্জ্বল হইয়া প্রভাসিত হইতেছিল। তত্পরি স্পন্দনরহিত কুমুমশ্রেণী অর্দ্ধপ্রক্ষুটিত হইয়া নীল জলে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল; চারিদিকে বৃক্ষমালা নিঃশব্দে পরস্পরাগ্নিষ্ট হইয়া আকাশের সীমা নির্দেশ করিতেছিল; কচিং ছই একটা দীর্ঘ শাখা উল্লোখিত হইয়া আকাশপটে চিত্রিত হইয়া রহিয়াছিল। তলস্থ অন্ধকারপুঞ্জমধ্য হইতে নবক্ষুট-কুমুমসৌরভ আসিতেছিল। গিরিজায়া সোপানোপরি উপবেশন করিল।

গিরিজায়া প্রথমে ধীরে ধীরে, মৃহ মৃহ গীত আরম্ভ করিল—যেন নবশিক্ষিতা বিহঙ্গী প্রথমোদ্যমে স্পষ্ট গান করিতে পারিতেছে না। ক্রমে তাহার স্বর স্পষ্টতা-লাভ করিতে লাগিল—ক্রমে ক্রমে উচ্চতর হইতে লাগিল, শেষে সেই সর্বাসঙ্গসম্পূর্ণ তানলয়বিশিষ্ট কমনীয় কণ্ঠধ্বনি, পুষ্করিণী, উপবন, আকাশ বিপ্লুত করিয়া স্বর্গ-চ্যুত স্বরসরিতরঙ্গ স্বরূপ যুগালিনীর কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। গিরিজায়া গায়িল;—

“সন্ধ্যা না গেলো

যে দিন পেল্লমু সেই বমুনাকি তীরে,
গায়ত নাচত সুন্দর ধীরে ধীরে,
ওঁহি পর পিয় সেই, কাহে কালো নীরে,
জীবন না গেলো ?

কিরি স্বপ্ন আয়নু, না কহনু বোলি,
ভিতায়নু আঁখিনীরে আপনা আচোলি,
সোই সোই পিয় সেই কাহে লো পরাণি,
তইখন না গেলো ?

‘শুননু শ্রবণ পথে মধুর বাজে,
রাধে রাধে রাধে রাধে বিপিন মাঝে ;
যব শুননু লাগি সেই, সো মধুর বোলি,
জীবন না গেলো ?

ধায়নু পিয় সেই, সোহি উপকূলে,
লুটায়নু কাঁদি সেই শ্যামপদমূলে,
সোহি পদমূলে রই, কাহে লো হামারি,
মরণ না ভেল ?”

গিরিজায়া গায়িতে গায়িতে দেখিলেন, তাঁহার
স্বপ্নে চক্রে কিরনোপরি মনুষ্যের ছায়া পড়িয়াছে ।
কিরিয়া দেখিলেন, মৃগালিনী দাঁড়াইয়া আছেন । তাঁহার
মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন, মৃগালিনী কাঁদিতেছেন ।

গিরিজায়া দেখিয়া হর্ষাধিত হইলেন,—তিনি বুকিতে
পারিলেন যে যখন মৃগালিনীর চকুতে জল আসিয়াছে—

তখন তাঁহার ক্লেশের কিছু শমতা হইয়াছে। ইহা সকলে বুঝে না—মনে করে “কই, ইহার চক্ষুতে ত জল দেখিলাম না, তবে ইহার কিসের দুঃখ ?” যদি ইহা সকলে বুঝিত, সংসারের কত মর্ষপীড়াই না জানি নিবারণ হইত।

কিয়ৎক্ষণ উভয়েই নীরব হইয়া রহিল। মৃগালিনী কিছু বলিতে পারেন না; গিরিজায়াও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারে না। পরে মৃগালিনী কহিলেন “গিরিজায়া, আর একবার তোমাকে যাইতে হইবে।”

গি। আবার সে পাষণ্ডের নিকট যাইব কেন ?

মৃ। পাষণ্ড বলিও না। হেমচন্দ্র ভ্রাস্ত হইয়া থাকিবেন—এ সংসারে অভ্রাস্ত কে ? কিন্তু হেমচন্দ্র পাষণ্ড নহেন। আমি স্বয়ং তাঁহার নিকট এখনই যাইব—তুমি সঙ্গে চল। তুমি আমাকে ভগিনীর অধিক স্নেহ কর—তুমি আমার জন্ত না করিয়াছ কি ? তুমি কখনও আমাকে অকারণে মনঃপীড়া দিবে না—কখনও আমার নিকট এ সকল কথা মিথ্যা করিয়া বলিবে না, ইহা আমি নিশ্চিত জানি। কিন্তু তাই বলিয়া, আমার হেমচন্দ্র আমাকে বিনাপরাধে ত্যাগ করিলেন, ইহা তাঁহার মুখে না শুনিয়া কি প্রকারে অন্তঃকরণকে স্থির করিতে পারি ? যদি তাঁহার নিজ মুখে শুনি যে, তিনি

মৃগালিনীকে কুলটা ভাবিয়া ত্যাগ করিলেন, তবে এ প্রাণ
বিসর্জন করিতে পারিব ।

গি । প্রাণবিসর্জন ! সে কি মৃগালিনী ?

মৃগালিনী কোন উত্তর করিলেন না । গিরিজায়ার
স্বপ্নে বাহুস্থাপন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন ।
গিরিজায়াও রোদন করিল ।

নবম পরিচ্ছেদ ।

অমৃতে গরল—গরলামৃত ।

হেমচন্দ্র, আচার্য্যের কথায় বিশ্বাস করিয়া মৃগালিনীকে
উপরিভ্রা বিবেচনা করিয়াছিলেন ; মৃগালিনীর পত্র পাঠ
না করিয়া তাহা ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছিলেন, তাঁহার
দূতীকে বেত্রাঘাত করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন । কিন্তু
ইহা বলিয়া তিনি মৃগালিনীকে ভাল বাসিতেন না, তাহা
নহে । মৃগালিনীর জন্ত তিনি রাজ্যত্যাগ করিয়া মথুরা-
বাসী হইয়াছিলেন । এই মৃগালিনীর জন্ত গুরুর প্রতি
শরসন্ধান করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, মৃগালিনীর জন্ত
গোড়ে নিজ ব্রত বিশ্বৃত হইয়া ভিখারিণীর তোষামদ

করিয়াছিলেন। আর এখন ? এখন হেমচন্দ্র মাধবা-
চার্য্যকে শূল দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, “মৃগালিনীকে এই
শূলে বিদ্ধ করিব !” কিন্তু তাই বলিয়া কি, এখন তাঁহার
স্নেহ একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল ? স্নেহ কি এক-
দিনে ধ্বংস হইয়া থাকে ? বহুদিন অবাধি পার্শ্বতীয় বারি
পৃথিবী-হৃদয়ে বিচরণ করিয়া আপন গতিপথ নিখাত
করে, একদিনের সূর্য্যোভাসে কি সে নদী শুষ্ক ?
জলের যে পথ নিখাত হইয়াছে, জল সেই পথেই যাইবে ;
সে পথ রোধ কর, পৃথিবী ভাসিয়া যাইবে। হেমচন্দ্র
সেই রাত্রিতে নিজ শয়নকক্ষে, শয্যোপরি শয়ন করিয়া
সেই মুক্ত বাতায়নসন্নিধানে মস্তক রাখিয়া, বাতায়ন-পথে
দৃষ্টি করিতেছিলেন—তিনি কি নৈশ শোভা দৃষ্টি করিতে
ছিলেন ? যদি তাঁহাকে সে সময় কেহ জিজ্ঞাসা করিত
যে, রাত্রি সজ্যোৎস্না কি অন্ধকার, তাহা তিনি তখন
সহসা বলিতে পারিতেন না। তাঁহার হৃদয়মধ্যে যে
রজনীর উদর হইয়াছিল, তিনি কেবল তাহাই দেখিতে-
ছিলেন সে রাত্রি ত তখনও সজ্যোৎস্না ! নহিলে তাঁহার
উপাধান অর্ধ কেন ? কেবল মেঘোদয় মাত্র। যাহার
হৃদয়-আকাশে অন্ধকার বিরাজ করে, সে রোদন
করে না।

যে কখনও রোদন করে নাই, সে মনুষ্য মধ্যে অধম । তাহাকে কখনও বিশ্বাস করিও না । নিশ্চিত জানিও সে পৃথিবীর সুখ কখনও ভোগ করে নাই—পরের সুখও কখনও তাহার সহ হয় না । এমন হইতে পারে যে, কোন আশ্চর্যজনক মহাত্মা বিনা বাষ্পমোচনে গুরুতর মনঃপীড়া সকল সহ করিতেছেন, এবং করিয়া থাকেন ; কিন্তু তিনি যদি কস্মিন্ কালে, এক দিন বিরলে একবিন্দু অশ্রুজলে পৃথিবী সিক্ত না করিয়া থাকেন, তবে তিনি চিত্তজরী মহাত্মা হইলে হইতে পারেন, কিন্তু আমি বরং চোরের সহিত প্রণয় করিব, তথাপি তাঁহার সঙ্গে নহে ।

হেমচন্দ্র রোদন করিতেছিলেন,—যাহাকে পাপিষ্ঠা, মনে স্থান দিবার অযোগ্য, বলিয়া জানিয়াছিলেন, তাহার জন্ত রোদন করিতেছিলেন । মৃগালিনীর কি তিনি দোষ আলোচনা করিতেছিলেন ? তাহা করিতেছিলেন বটে, কিন্তু কেবল তাহাই নহে । এক একবার মৃগালিনীর প্রেমপরিপূর্ণ মুখমণ্ডল, প্রেমপরিপূর্ণ কথা, প্রেমপরিপূর্ণ কার্য সকল মনে করিতেছিলেন । সেই মৃগালিনী কি অবিখ্যাসিনী ? একদিন মথুরায় হেমচন্দ্র মৃগালিনীর নিকট একখানি লিপি প্রেরণ করিবার জন্ত ব্যস্ত হইয়াছিলেন, উপযুক্ত বাহক পাইলেন না ; কিন্তু মৃগালিনীকে গবাক্ষ-

পথে দেখিতে পাইলেন । তখন হেমচন্দ্র একটা আত্মফলের উপরে আবশ্যক কথা লিখিয়া মৃগালিনীর ক্রোড় লক্ষ্য করিয়া বাতায়নপথে প্রেরণ করিলেন ; আত্ম ধরিবার জন্য মৃগালিনী কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া আসাতে আত্ম মৃগালিনীর ক্রোড়ে না পড়িয়া তাঁহার কর্ণে লাগিল, অমনি তদাঘাতে কর্ণবিলম্বী রত্নকুণ্ডল কর্ণ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া কাটিয়া পড়িল ; কর্ণক্রত রুধিরে মৃগালিনীর গ্রীবা ভাসিয়া গেল । মৃগালিনী ক্রক্ষেপও করিলেন না ; কর্ণে হস্তও দিলেন না ; হাসিয়া আত্ম তুলিয়া লিপি পাঠপূর্বক, তখনই তৎপৃষ্ঠে প্রত্যুত্তর লিখিয়া আত্ম প্রতিপ্রেরণ করিলেন । এবং যতক্ষণ হেমচন্দ্র দৃষ্টিপথে রহিলেন, ততক্ষণ বাতায়নে থাকিয়া হাস্তমুখে দেখিতে লাগিলেন । হেমচন্দ্রের তাহা মনে পড়িল । সেই মৃগালিনী কি অবিধাসিনী ? ইহা সম্ভব নহে । আর একদিন মৃগালিনীকে বৃশ্চিক দংশন করিয়াছিল । তাহার যন্ত্রণায় মৃগালিনী মুমূর্ষুভাৱে কাতর হইয়া ছিলেন । তাঁহার এক জন পরিচারিকা তাহার উত্তম ঔষধ জানিত ; তৎপ্রয়োগ মাত্র যন্ত্রণা একেবারে শীতল হয় ; দাসী শীঘ্র ঔষধ আনিতে গেল । ইত্যবসরে হেমচন্দ্রের দূতী গিয়া কহিল যে,

হেমচন্দ্র উপবনে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন। বৃহত্তম
 মধ্যে ঔষধ আনিত, কিন্তু মৃগালিনী তাহার অপেক্ষা
 করেন নাই; অমনি সেই মরণাধিক বহুলা বিদ্রুত
 হইয়া উপবনে উপস্থিত হইলেন। আর ঔষধ প্রেরণ
 হইল না। হেমচন্দ্রের তাহা স্বরণ হইল। সেই মৃগালিনী
 ব্রাহ্মণকুলকলঙ্ক ঘোমকেশের জন্ত হেমচন্দ্রের কাছে
 অবিখ্যাসিনী হইবে? না, তা কখনই হইতে পারে না।
 আর একদিন হেমচন্দ্র মথুরা হইতে গুরুদর্শনে বাইতে-
 ছিলেন; মথুরা হইতে এক গ্রহরের পথ আসিয়া
 হেমচন্দ্রের গীড়া হইল। তিনি এক পাহনিবাসে পড়িয়া
 রহিলেন; কোন প্রকারে এ সংবাদ অন্তঃপুরে মৃগালিনীর
 কর্ণে প্রবেশ করিল। মৃগালিনী সেই রাত্রিতে এক
 ধাত্রীমাত্র সঙ্গে লইয়া রাত্রিকালে সেই এক যোজন পথ
 পদব্রজে অতিক্রম করিয়া হেমচন্দ্রকে দেখিতে আসিলেন।
 যখন মৃগালিনী পাহনিবাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন,
 তখন তিনি পথপ্রান্তিতে প্রায় নির্জীব; চরণকণ্ড
 বিকৃত,—কৃধির বহিতেছিল। সেই রাত্রিতেই মৃগালিনী
 পিতার ভয়ে প্রত্যাঘর্ষন করিলেন। গৃহে আসিয়া তিনি
 স্বয়ং গীড়িতা হইলেন। হেমচন্দ্রের তাহাও মনে পড়িল।
 সেই মৃগালিনী নরোধম ঘোমকেশের জন্ত তাঁহাকে

ভ্যাগ করিবে ? সে কি অবিদ্বাসিনী হইতে পারে ?
 যে এমন কথায় বিশ্বাস করে, সেই অবিদ্বাসী—সে
 নরাধম, সে গণ্ডমূৰ্খ । হেমচন্দ্র শতবার ভাবিতেছিলেন,
 “কেন আমি মৃগালিনীর পত্র পড়িলাম না ? নব্বীপে
 কেন আসিয়াছে, তাহাই বা কেন জানিলাম না ?”
 পত্রখণ্ডগুলি যে বনে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, তাহা
 যদি সেখানে পাওয়া যায়, তবে তাহা “যুক্ত করিয়া
 যতদূর পারেন, ততদূর মর্শ্বাবগত হইবেন, এইরূপ
 প্রত্যাশা করিয়া একবার সেই বন পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন ;
 কিন্তু সেখানে বনভলম্হ অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পারেন
 নাই । বায়ু নিপিথও সকল উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে ।
 যদি তখন আপন দক্ষিণ বাহু ছেদন করিয়া দিলে
 হেমচন্দ্র সেই নিপিথওগুলি পাইতেন, তবে হেমচন্দ্র
 তাহাও দিতেন ।

আবার ভাবিতেছিলেন, “আচার্য্য কেন মিথ্যা কথা
 বলিবেন ? আচার্য্য অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ—কখনও মিথ্যা
 বলিবেন না । বিশেষ আমাকে পুত্রাধিক স্নেহ করেন—
 জানেন, এ সংবাদে আমার মরণাধিক যত্ননা হইবে, কেন
 আমাকে তিনি মিথ্যা কথা বলিয়া এত যত্ননা দিবেন ?
 আর তিনিও স্বেচ্ছাক্রমে এ কথা বলেন নাই । আদি

সদর্পে তাঁহার নিকট কথা বাহির করিয়া লইলাম—যখন আমি বলিলাম যে, আমি সকলই অবগত আছি—তখনই তিনি কথা বলিলেন। মিথ্যা বলিবার উদ্দেশ্য থাকিলে, বলিতে অনিচ্ছুক হইবেন কেন? তবে হইতে পারে হৃষীকেশ তাঁহার নিকট মিথ্যা বলিয়া থাকিবে। কিন্তু হৃষীকেশই বা অকারণে গুরুর নিকট মিথ্যা বলিবে কেন? আর মৃগালিনীই বা তাহার গৃহত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে আসিবে কেন?”

যখন এইরূপ ভাবেন, তখন হেমচন্দ্রের মুখ কালিমাময় হয়, ললাট ঘর্মসিক্ত হয়; তিনি শয়ন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসেন; দন্তে অধর দংশন করেন, লোচন আরক্ত এবং বিস্ফারিত হয়; শূলধারণ জন্ত হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হয়। আবার মৃগালিনীর প্রেমময় মুখমণ্ডল মনে পড়ে। অমনি ছিন্নমূল বৃক্ষের ত্রায় শয্যার পতিত হইলেন; উপাধানে মুখ লুকায়িত করিয়া শিশুর ত্রায় রোদন করেন। হেমচন্দ্র ঐরূপ রোদন করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার শয়নগৃহের দ্বার উদঘাটিত হইল। গিরিজায়া প্রবেশ করিল।

হেমচন্দ্র প্রথমে মনে করিলেন, মনোরমা। তখনই দেখিলেন, সে কুসুমময়ী মূর্তি নহে। পরে চিনিলেন যে,

গিরিজায়া । প্রথমে বিস্মিত, পরে আক্লান্ত, শেষে কোতূহলাক্রান্ত হইলেন । বলিলেন, “তুমি আবার কেন ?”

গিরিজায়া কহিল, “আমি মৃগালিনীর দাসী । মৃগালিনীকে আপনি ত্যাগ করিয়াছেন । কিন্তু আপনি মৃগালিনীর ত্যাজ্য নহেন । সুতরাং আমাকে আবার আসিতে হইয়াছে । আমাকে বেত্রাঘাত করিতে সাধ থাকে, করুন । ঠাকুরাণীর জন্ত এবার তাহা সহিব স্থির সঙ্কল্প করিয়াছি ।”

এ তিরস্কারে হেমচন্দ্র অত্যন্ত অপ্রতিভ হইলেন । বলিলেন, “তোমার কোন শঙ্কা নাই । স্ত্রীলোককে আমি মারিব না । তুমি কেন আসিয়াছ ? মৃগালিনী কোথায় ? বৈকালে তুমি বলিয়াছিলে, তিনি নবদ্বীপে আসিয়াছেন ; নবদ্বীপে আসিয়াছেন কেন ? আমি তাঁহার পত্র না পড়িয়া ভাল করি নাই ।”

গি । মৃগালিনী নবদ্বীপে আপনাকে দেখিতে আসিয়াছেন ।

হেমচন্দ্রের শরীর কণ্টকিত হইল । এই মৃগালিনীকে কুলটা বলিয়া অবমানিত করিয়াছেন ? তিনি পুনরপি গিরিজায়াকে কহিলেন, “মৃগালিনী কোথায় আছেন ?”

গি । তিনি আপনার নিকট জন্মের শোধ বিদায়

লইতে আসিয়াছেন । সরোবর-তীরে দাঁড়াইয়া আছেন ।
আপনি আসুন ।

এই বলিয়া গিরিজায়া চলিয়া গেল । হেমচন্দ্র তাহার
পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন ।

গিরিজায়া বাপীতীরে, যথায় মৃগালিনী সোপানোপরি
বসিয়াছিলেন, তথায় উপনীত হইল । হেমচন্দ্রও তথায়
আসিলেন । গিরিজায়া কহিল, “ঠাকুরাণী ! উঠ !
রাজপুত্র আসিয়াছেন ।”

মৃগালিনী উঠিয়া দাঁড়াইলেন । উভয়ে উভয়ের মুখ
নিরীক্ষণ করিলেন । মৃগালিনীর দৃষ্টিলোপ হইল ; অশ্রু-
জলে চক্ষু পূরিয়া গেল । অবনমনশাখা ছিন্ন হইলে
যেমন শাখাবিলম্বিনী লতা ভূতলে পড়িয়া যায়, মৃগালিনী
সেইরূপ হেমচন্দ্রের পদমূলে পতিত হইলেন । গিরিজায়া
অন্তরে গেল ।

দশম পরিচ্ছেদ ।

এত দিনের পর !

হেমচন্দ্র মৃগালিনীকে হস্তে ধরিয়া তুলিলেন । উভয়ে উভয়ের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইলেন ।

এত কাল পরে দুই জনের সাক্ষাৎ হইল । যে দিন প্রদোষকালে, যমুনার উপকূলে নৈদাখানিলসস্তাডিত্ত একুলমূলে দাঁড়াইয়া, নীলাম্বুময়ীর চঞ্চল-তরঙ্গ-শিরে নক্ষত্রশির প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিতে করিতে উভয়ে উভয়ের নিকট সজলনয়নে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার পর এই সাক্ষাৎ হইল । নিদাঘের পর কুর্মা গিয়াছে, বর্ষার পর শরৎ যায়, কিন্তু ইহাদের হৃদয় মধ্যে যে কত দিন গিয়াছে, তাহা কি ঋতুগণনায় গণিত হইতে পারে ?

সেই নিশীথ সময়ে স্বচ্ছসলিলা-বাপী-তীরে, দুই জনে পরস্পর সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইলেন । চারিদিকে, সেই নিবিড় বন, ঘনবিগ্ৰহ লতাশ্রগ্বিশোভী বিশাল বিটপী-সকল দৃষ্টিপথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল ; সম্মুখে নীল-

নীরদখণ্ডবৎ দীর্ঘিকা শৈবাল-কুমুদ-কঙ্কার সহিত বিস্তৃত
 স্নহিয়াছিল। মাথার উপরে চন্দ্রনক্ষত্রজলদ সহিত আকাশ
 আলোকে হাসিতেছিল। চন্দ্রালোক—আকাশে, বৃক্ষ-
 শিরে, লতাপল্লবে, বাপীসোপানে, নীলজলে—সর্বত্র
 হাসিতেছিল। প্রকৃতি স্পন্দহীনা, ধৈর্যময়ী। সেই
 ধৈর্যময়ী প্রকৃতির প্রসাদমধ্যে, মৃগালিনী হেমচন্দ্র মুখে
 মুখে দাঁড়াইলেন।

ভাষায় কি শব্দ ছিল না? তাঁহাদিগের মনে কি
 বলিবার কথা ছিল না? যদি মনে বলিবার কথা ছিল,
 ভাষায় শব্দ ছিল, তবে কেন ইহারা কথা কহে না? তখন
 চক্ষুর দেখাতেই মন উন্মত্ত—কথা কহিবে কি প্রকারে?
 এ সময় কেবলমাত্র প্রণয়ীর নিকটে অবস্থিতিতে এত
 স্নেহ যে, হৃদয়মধ্যে অণু স্নেহের স্থান থাকে না। যে সে
 স্নেহভোগ করিতে থাকে, সে, আর কথার স্নেহ বাসনা
 করে না।

যে সময়ে এত কথা বলিবার থাকে যে, কোন্ কথা
 আগে বলিব তাহা কেহ স্থির করিতে পারে না।

মনুষ্যভাষায় এমন কোন্ শব্দ আছে যে, সে সময়ে
 প্রযুক্ত হইতে পারে?

তাঁহারা পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

হেমচন্দ্র মৃগালিনীর সেই প্রেমময় মুখ আবার দেখিলেন—
—স্বীকেশবাক্যে প্রত্যয় দূর হইতে লাগিল। সে গ্রন্থের
ছত্রে ছত্রে ত পবিত্রতা লেখা আছে। হেমচন্দ্র তাঁহার
লোচনপ্রতি চাহিয়া রহিলেন ; সেই অপূৰ্ণ আয়তনশালী,
ইন্দীবর-নিন্দী, অন্তঃকরণের দর্পণরূপ চক্ষুঃপ্রতি চাহিয়া
রহিলেন—তাহা হইতে কেবল প্রেমাক্রম বহিতেছে !—
সে চক্ষু যাহার, সে কি অবিখ্যাসিনী !

হেমচন্দ্র প্রথমে কথা কহিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,
“মৃগালিনী ! কেমন আছ ?”

মৃগালিনী উত্তর করিতে পারিলেন না। এখনও
তাঁহার চিত্ত শান্ত হয় নাই ; উত্তরের উপক্রম করিলেন,
কিন্তু আবার চক্ষুর জলে ভাসিয়া গেল। কণ্ঠ রুদ্ধ হইল,
কথা সরিল না।

হেমচন্দ্র আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কেন
আসিয়াছ ?”

মৃগালিনী তথাপি উত্তর করিতে পারিলেন না।
হেমচন্দ্র তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া সোপানোপরি
বসাইলেন, স্বয়ং নিকটে বসিলেন, মৃগালিনীর যে কিছু
চিত্তের স্থিরতা ছিল এই আদরে তাহার লোপ হইল।
ক্রমে ক্রমে তাঁহার মস্তক আপনি আসিয়া হেমচন্দ্রের স্বক্ষে

স্থাপিত হইল, মৃগালিনী তাহা জানিয়াও জানিতে পারিলেন না। মৃগালিনী আবার রোদন করিলেন—
তাঁহার অশ্রুজলে হেমচন্দ্রের স্বরূপ, বক্ষঃ প্রাবৃত হইল। এ
সংসারে মৃগালিনী যত সুখ অনুভূত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে
কোন সুখই এই রোদনের তুল্য নহে।

হেমচন্দ্র আবার কথা কহিলেন, “মৃগালিনি! আমি
তোমার নিকট গুরুতর অপরাধ করিয়াছি। সে অপরাধ
আমার ক্ষমা করিও। আমি তোমার নামে কলঙ্ক রটনা
গুনিয়া তাহা বিশ্বাস করিয়াছিলাম। বিশ্বাস করিবার কতক
কারণও ঘটিয়াছিল—তাহা তুমি দূর করিতে পারিবে।
যাহা আমি জিজ্ঞাসা করি, তাহার পরিষ্কার উত্তর দাও।”

মৃগালিনী হেমচন্দ্রের স্বরূপ হইতে মস্তক না তুলিয়া
কহিলেন, “কি?”

হেমচন্দ্র বলিলেন, “তুমি স্ববীকেশের গৃহত্যাগ করিলে
কেন?”

এ নাম শ্রবণমাত্র কুণ্ডিতা কণিনীর স্থায় মৃগালিনী
মাথা তুলিল। কহিল, “স্ববীকেশ আমাকে গৃহ হইতে
বিদায় করিয়া দিয়াছে।”

হেমচন্দ্র ব্যথিত হইলেন—অন্ন সন্ধিহান হইলেন—
কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলেন। এই অবকাশে মৃগালিনী

পুনরপি হেমচন্দ্রের স্বন্ধে মস্তক রাখিলেন। সে সুখাসনে শিরোরক্ষা এত সুখ যে, মৃগালিনী তাহাতে রক্ষিত হইয়া থাকিতে পারিলেন না।

হেমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন তোমাকে স্ববীকেশ গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিল ?”

মৃগালিনী হেমচন্দ্রের হৃদয়মধ্যে মুখ লুকাইলেন। অতি মৃদুরবে কহিলেন, “তোমাকে কি বলিব ? স্ববীকেশ আমাকে কুলটা বলিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে।”

শ্রুতমাত্র তাঁরের শ্রাব হেমচন্দ্র দাঁড়াইয়া উঠিলেন। মৃগালিনীর মস্তক তাঁহার বক্ষস্থল হইয়া সোপানে আহত হইল।

“পাপীয়সি—নিজমুখে স্বীকৃতা হইলি !” এই কথা দস্তমধ্য হইতে ব্যক্ত করিয়া হেমচন্দ্র বেগে প্রস্থান করিলেন। পথে গিরিজায়াকৈ দেখিলেন; গিরিজায়া তাঁহার সজলজলদভীম মূর্তি দেখিয়া চমকিয়া দাঁড়াইল। লিখিতে লজ্জা করিতেছে—কিন্তু না লিখিলে নয়—হেমচন্দ্র পদাঘাতে গিরিজায়াকে পথ হইতে অপনৃত্য করিলেন। বলিলেন, “তুমি বাহার দূতী, তাহাকে পদাঘাত করিলে আমার চরণ কলঙ্কিত হইত।” এই বলিয়া হেমচন্দ্র চলিয়া গেলেন।

যাহার ধৈর্য্য নাই, যে ক্রোধের জন্মমাত্র অন্ধ হয়, সে সংসারের সকল স্মৃথে বঞ্চিত । কবি কল্পনা করিয়াছেন যে, কেবল অধৈর্য্য মাত্র দোষে বীরশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্যের নিপাণ্ড হইয়াছিল । “অশ্বখামা হতঃ” এই শব্দ শুনিয়া তিনি ধনুর্বাণ ত্যাগ করিলেন । প্রশান্তুর দ্বারা সবিশেষ তস্থ লইলেন না । হেমচন্দ্রের কেবল অধৈর্য্য নহে—অধৈর্য্য, অভিমান, ক্রোধ ।

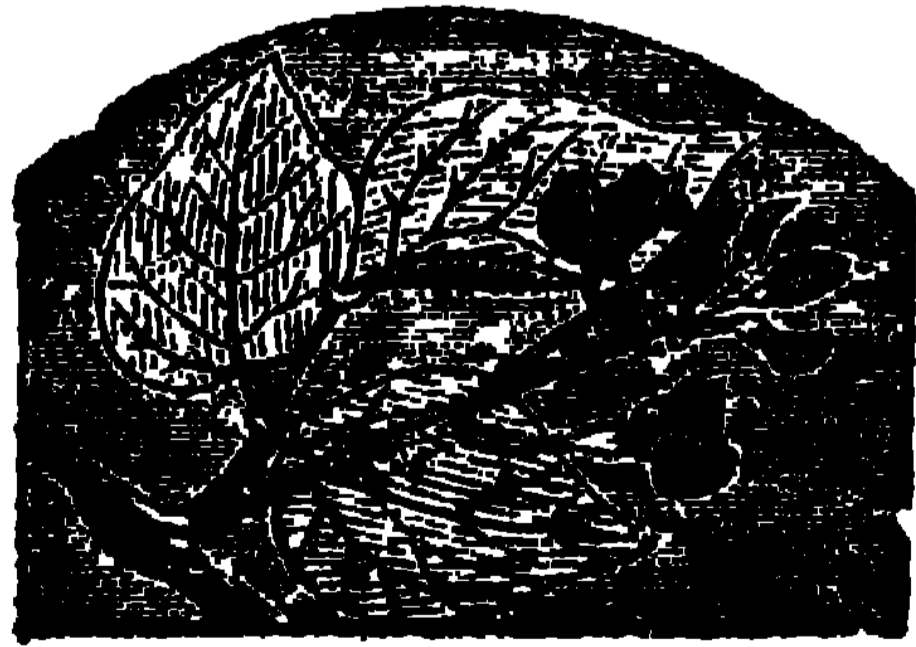
শীতলসমীরণময়ী উষার পিঙ্গল মূর্ত্তি বাপীতীর-বনে উদয় হইল । তখনও মৃগালিনী আহত মস্তক ধারণ করিয়া সোপানে বসিয়া আছেন । গিরিজায়া জিজ্ঞাসা করিল,

“ঠাকুরাণি, আঘাত কি গুরুতর বোধ হইতেছে ?”

মৃগালিনী কহিলেন, “কিসের আঘাত ?”

গি । মাথায় ।

মৃ । মাথায় আঘাত ? আমার মনে হয় না ।



ଚତୁର୍ଥ ଖଣ୍ଡ ।





চতুর্থ খণ্ড ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

উর্গনাভ ।

যতক্ষণ মৃগালিনীর সুখের তারা ডুবিতেছিল, ততক্ষণ গোড়দেশের সৌভাগ্যশীলও সেই পথে যাইতেছিল। যে ব্যক্তি রাখিলে গোড় রাখিতে পারিত, সে উর্গনাভের শ্রায় বিরলে বসিয়া অভাগা জন্মভূমিকে বন্ধ করিবার জগ্ন জাল পাতিতেছিল। নিশীথ সময়ে নিভতে বসিয়া ধর্ম্মাধিকার পশুপতি, নিজ দক্ষিণহস্তস্বরূপ শাস্ত্রশীলকে ভৎসনা করিতেছিলেন, “শাস্ত্রশীল! প্রাতে যে সংবাদ

দিয়াছ, তাহা কেবল তোমার অদক্ষতার পরিচয় মাত্র।
তোমার প্রতি আর কোন ভার দিবার ইচ্ছা নাই।”

শান্তশীল কহিল, “যাহা অসাধ্য, তাহা পারি নাই।
অন্যকার্যে পরিচয় গ্রহণ করুন।”

প। সৈনিকদিগকে কি উপদেশ দেওয়া হইতেছে ?

শা। এই যে, আমাদিগের আজ্ঞা না পাইলে কেহ
না সাজে।

প। প্রান্তপাল ও কোষ্ঠপালদিগকে কি উপদেশ
দেওয়া হইয়াছে ?

শা। এই বলিয়া দিয়াছি যে, অচিরাৎ যবন-সম্রাটের
নিকট হইতে কর লইয়া কয়জন যবন দূতস্বরূপ আসিতেছে,
তাহাদিগের গতিরোধ না করে।

প। দামোদর শর্মা উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিয়াছেন
কি না ?

শা। তিনি বড় চতুরের স্থায় কার্য্য নিৰ্ব্বাহ করিয়া-
ছেন।

প। সে কি প্রকার ?

শা। তিনি একখানি পুরাতন গ্রন্থের একখানি পত্র
পরিবর্তন করিয়া তাহাতে আপনার রচিত কবিতাগুলি
বসাইয়াছিলেন। তাহা লইয়া অল্প প্রাণে রাজাকে

শ্রবণ করাইয়াছেন এবং মাধবাচার্য্যের অনেক নিন্দা করিয়াছেন ।

প। কবিতায় ভবিষ্যৎ গোড়বিজেতার রূপবর্ণনা সবিস্তারে লিখিত আছে । সে বিষয়ে মহারাজ কোন অনুসন্ধান করিয়াছিলেন ?

শা। করিয়াছিলেন । মদনসেন সম্প্রতি কাশীধাম হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, এ সংবাদ মহারাজ অবগত আছেন । মহারাজ কবিতায় ভবিষ্যৎ গোড়বিজেতার অবয়ব বর্ণনা শুনিয়া তাঁহাকে ডাকিতে পাঠাইলেন । মদনসেন উপস্থিত হইলে মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন, তুমি মগধে যবন-রাজপ্রতিনিধিকে দেখিয়া আসিয়াছ ?” সে কহিল “আসিয়াছি ।” মহারাজ তখন আজ্ঞা করিলেন, “সে দেখিতে কি প্রকার বিবৃত কর ।” তখন মদনসেন, বখতিয়ার খিলজির যথার্থ যে রূপ দেখিয়াছেন, তাহাই বিবৃত করিলেন । কবিতাতেও সেইরূপ বর্ণিত ছিল । সুতরাং গোড়বিজয় ও তাঁহার রাজ্যনাশ নিশ্চিত বলিয়া বুঝিলেন ।

প। তাহার পর ?

শা। রাজা তখন রোদন করিতে লাগিলেন । কহিলেন, “আমি এ বৃদ্ধ বয়সে কি করিব ? সপরিবারে

ষবনহস্তে প্রাণে নষ্ট হইয় দেখিতেছি!” তখন দামোদর শিঙ্কামত কহিলেন, “মহারাজ! ইহার সঙ্গায় এই যে, অবসন্ন থাকিতে থাকিতে আপনি সপরিবারে তীর্থযাত্রা করুন। ধর্ম্মাধিকারের প্রতি রাজকার্যের ভার দিয়া যাউন। তাহা হইলে আপনার শরীর রক্ষা হইবে। পরে শাস্ত্র মিথ্যা হয়, রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন।” রাজা এ পরামর্শে সন্তুষ্ট হইয়া নৌকাসজ্জা করিতে আদেশ করিয়াছেন। অচিরে সপরিবারে তীর্থযাত্রা করিবেন।

প। দামোদর সাধু। তুমিও সাধু। এখন আমার মনস্কামনা সিদ্ধির সম্ভাবনা দেখিতেছি। নিতান্ত পক্ষে স্বাধীন রাজা না হই, ষবন-রাজ-প্রতিনিধি হইব। কার্য-সিদ্ধি হইলে, তোমাদিগকে সাধ্যমত পুরস্কৃত করিতে ক্রটি করিব না, তাহা ত জান। এক্ষণে বিদায় হও। কাল প্রাতেই যেন তীর্থযাত্রার জন্ত নৌকা প্রস্তুত থাকে। শাস্ত্রশীল বিদায় হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

বিনা সূতার হার ।

পশুপতি উচ্চ অষ্টালিকায় বহুভূতা সমভিব্যাহারে বাস করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার পুরী 'কানন হইতেও অন্ধকার । গৃহ বাহাতে আলো হয়, স্ত্রী পুত্র পরিবার—এ সকল তাঁহার গৃহে ছিল না ।

অন্য শাস্ত্রশীলের সহিত কথোপকথনের পর, পশুপতির সেই সকল কথা মনে পড়িল । মনে ভাবিলেন, “এত কালের পর বুঝি এ অন্ধকার পুরী আলো হইল—যদি জগদম্বা অনুকূলা হইতেন, তবে মনোরমা এ অন্ধকার ঘুচাইবে ।”

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে পশুপতি, শরনের পূর্বে অষ্টভূজাকে নিয়মিত প্রণামবন্দনাদির জন্তু দেবীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন । প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে তথায় মনোরমা বসিয়া আছে ।

পশুপতি কহিলেন, “মনোরমা, কখন আসিলে ?”

মনোরমা পূজাবশিষ্ট পুষ্পগুলি লইয়া বিনাসূত্রে

মাল। গাঁথিতেছিল। কথায় কোন উত্তর দিল না। পশুপতি কহিলেন, “আমার সঙ্গে কথা কও। যতক্ষণ তুমি থাক, ততক্ষণ সকল যন্ত্রণা বিস্মৃত হই।”

মনোরমা মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল। পশুপতির মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল, ক্ষণেক পরে কহিল, “আমি তোমাকে কি বলিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা আমার মনে হইতেছে না।”

পশুপতি কহিলেন, “তুমি মনে কর। আমি অপেক্ষা করিতেছি।”

পশুপতি বসিয়া রহিলেন, মনোরমা মালা গাঁথিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে পশুপতি কহিলেন, “আমারও কিছু বলিবার আছে, মনোযোগ দিয়া শুন। আমি এ বয়স পর্য্যন্ত কেবল বিদ্যা উপার্জন করিয়াছি—বিষয়ালোচনা করিয়াছি, অর্থোপার্জন করিয়াছি। সংসারধর্ম করি নাই; বাহাতে অনুরাগ তাহাই করিয়াছি, দারপরিগ্রহে অনুরাগ নাই, এজন্ত তাহা করি নাই। কিন্তু যে পর্য্যন্ত তুমি আমার নয়নপথে আসিয়াছ, সেই পর্য্যন্ত মনোরমালাভ আমার একমাত্র ধ্যান হইয়াছে। সেই লাভের জন্ত এই নিদাক্ষণ ব্রতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি জগদীশ্বরী

অনুগ্রহ করেন, তবে ছুই চারি দিনের মধ্যে রাজ্যলাভ করিব এবং তোমাকে বিবাহ করিব। ইহাতে তুমি বিধবা বলিয়া যে বিহ্বল শাস্ত্রীয় প্রমাণের দ্বারা আমি তাহার খণ্ডন করিতে পারিব। কিন্তু তাহাতে দ্বিতীয় বিঘ্ন এই যে, তুমি কুলীনকন্যা, জনার্দন শর্মা কুলীনশ্রেষ্ঠ, আমি শ্রোত্রিয়।”

মনোরমা এ সকল কথা কৰ্ণপাত করিতেছিল কি না সন্দেহ। পশুপতি দেখিলেন যে মনোরমা চিত্ত হারাইয়াছে। পশুপতি, সরলা অবিকৃত বালিকা মনোরমাকে ভালবাসিতেন,—প্রোচা তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী মনোরমাকে ভয় করিতেন। কিন্তু অদ্য ভাবান্তরে সন্তুষ্ট হইলেন না। তথাপি পুনরুদ্যম করিয়া পশুপতি কহিলেন, “কিন্তু কুলরীতি ত শাস্ত্রমূলক নহে, কুলনাশে ধর্মনাশ বা জাতিভ্রংশ হয় না। তাহার অজ্ঞাতে যদি তোমাকে বিবাহ করিতে পারি, তবে ক্ষতিই কি? তুমি সম্মত হইলেই, তাহা পারি। পরে তোমার পিতামহ জানিতে পারিলে বিবাহ ত ফিরিবে না।”

মনোরমা কোন উত্তর করিল না। সে সকল শ্রবণ করিয়াছিল কি না সন্দেহ। একটা কৃষ্ণবর্ণ মাস্কুলার তাহার নিকটে আসিয়া বসিয়াছিল, সে সেই

বিনাস্ত্রের মালা তাহার গলদেশে পরাইতেছিল। পরাইতে মালা খুলিয়া গেল। মনোরমা তখন আপন মস্তক হইতে কেশগুচ্ছ ছিন্ন করিয়া, তৎসূত্রে আবার মালা গাঁথিতে লাগিল।

পশুপতি উত্তর না পাইয়া নিঃশব্দে মালাকুম্মমধ্যে মনোরমার অনুপম অঙ্গুলির গতি মুঞ্চলোচনে দেখিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

বিহঙ্গী পিঞ্জরে ।

পশুপতি মনোরমার বুদ্ধিপ্রদীপ জ্বালিবার অনেক যত্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু ফলোৎপত্তি কঠিন হইল। পরিশেষে বলিলেন, “মনোরমা, রাত্রি অধিক হইয়াছে। আমি শয়নে যাই।”

মনোরমা অস্মানবদনে কহিলেন—“যাও।”

পশুপতি শয়নে গেলেন না। বসিয়া মালা গাঁথা দেখিতে লাগিলেন। আবার উপায়ান্তর স্বরূপ, ভয়সূচক

চিন্তার আবির্ভাবে কাব্যসিদ্ধ হইবেক ভাবিয়া, মনোরমাকে ভীতা করিবার জন্য পশুপতি কহিলেন, “মনোরমা, যদি হাতমধ্যে যবন আইসে, তবে তুমি কোথায় বাইবে ?”

মনোরমা মালা হইতে মুখ না তুলিয়া কহিল, “বাটীতে থাকিব ।”

পশুপতি কহিলেন, “বাটীতে তোমাকে কে রক্ষা করিবে ?”

মনোরমা পূর্ববৎ অশ্রু মনে কহিল, “জানি না ; নিরুপায় ।”

পশুপতি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি আমাকে কি বলিতে মন্দিরে আসিয়াছ ?”

ম। দেবতা প্রণাম করিতে ।

পশুপতি বিরক্ত হইলেন । কহিলেন, “তোমাকে মিনতি করিতেছি, মনোরমা; এইবার যাহা বলিতেছি, তাহা মনোযোগ দিয়া শুন—তুমি আজিও বল, আমাকে বিবাহ করিবে কি না ?”

মনোরমার মালা গাঁথা সম্পন্ন হইয়াছিল—সে একটা কৃষ্ণবর্ণ মার্জ্জারের গলায় পরাইতেছিল । পশুপতির কথা কর্ণে গেল না । মার্জ্জার মালা পরিধানে বিশেষ অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছিল—যতবার মনোরমা মালা তাহার

গলায় দিতেছিল, ততবার সে মালার তিতর হইতে মস্তক বাহির করিয়া লইতেছিল—মনোরমা কুন্দনিন্দিত মস্তে অধরদংশন করিয়া জ্বৎ হাসিতেছিল, আর আবার মাঝে তাহার গলায় দিতেছিল। পশুপতি অধিকতর বিরক্ত হইয়া বিড়ালকে এক চপেটাঘাত করিলেন—বিড়াল উর্দ্ধলাঙ্গুল হইয়া দূরে পলায়ন করিল। মনোরমা সেইরূপ দংশিতাধরে হাসিতে হাসিতে করত মালার পশুপতিরই মস্তকে পরাইয়া দিল।

মার্জার-প্রসাদ মস্তকে পাইয়া রাজপ্রসাদভোগী ধর্ম্মাধিকার হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন। অল্প ক্রোধ হইল—কিন্তু দংশিতাধরা হাশ্রময়ীর তৎকালীন অনুপম রূপমাধুরী দেখিয়া তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া গেল। তিনি মনোরমাকে আলিঙ্গন করিবার জন্ত বাহু প্রসারণ করিলেন—অমনি মনোরমা লক্ষ দিয়া দূরে দাঁড়াইল—পশ্চিমধ্যে উন্নত-কণা কালসর্প দেখিয়া পশ্চিক যেমন দূরে দাঁড়ায়, সেইরূপ দাঁড়াইল।

পশুপতি অপ্রতিভ হইলেন; কণেক মনোরমার মুখপ্রতি চাহিতে পারিলেন না—পরে চাহিয়া দেখিলেন—মনোরমা প্রৌঢ়বয়ঃপ্রফুল্লমুখী মহিষায়নী সুন্দরী।

পশুপতি কহিলেন, “মনোরমা, মোর আবিও মা।

তুমি আমার পত্নী—আমাকে বিবাহ কর ।” মনোরমা
পশুপতির মুখ প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়া কহিল,

“পশুপতি ! কেশবের কন্যা কোথায় ?”

পশুপতি কহিলেন, “কেশবের মেয়ে কোথায় জানি
না—জানিতেও চাহি না । তুমি আমার একমাত্র পত্নী ।”

ম । আমি জানি কেশবের মেয়ে কোথায়—বলিব ?

পশুপতি অবাক হইয়া মনোরমার মুখপ্রতি চাহিয়া
রহিলেন । মনোরমা বলিতে লাগিল,

“একজন জ্যোতির্বিদ গণনা করিয়া বলিয়াছিল যে,
কেশবের মেয়ে অল্পবয়সে বিধবা হইয়া স্বামীর অনুমুতা
হইবে । কেশব এই কথায়, অল্পকালে মেয়েকে হারাইবার
ভয়ে বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলেন । তিনি ধর্ম্মনাশের ভয়ে
মেয়েকে পাত্ৰস্থ করিলেন, কিন্তু বিধিলিপি খণ্ডাইবার
ভরসায় বিবাহের রাত্রিতেই মেয়ে লইয়া প্রয়াগে পলায়ন
করিলেন । তাঁহার অভিপ্রায় এই ছিল যে, তাঁহার
মেয়ে স্বামীর মৃত্যুসংবাদ কস্মিন্ কালে না পাইতে
পারেন । দৈবাধীন কিছুকাল পরে, প্রয়াগে কেশ-
বের মৃত্যু হইল । তাঁহার মেয়ে পূর্বেই মাতৃহীনা
হইয়াছিল—এখন মৃত্যুকালে কেশব হৈমবতীকে আচা-
র্যের হাতে সমর্পণ করিয়া গেলেন । মৃত্যুকালে

কেশব, আচার্য্যকে এই কথা বলিয়া গেলেন, “এই অনাথা মেয়েটিকে আপনার গৃহে রাখিয়া প্রতিপালন করিবেন । ইহার স্বামী পশুপতি—কিন্তু জ্যোতির্বিদেরা বলিয়া গিয়াছেন যে, ইনি অল্প বয়সে স্বামীর অনুমৃত হইবেন । অতএব আপনি আমার নিকট স্বীকার করুন যে, এই মেয়েকে কখনও বলিবেন না যে, পশুপতি ইহার স্বামী । অথবা পশুপতিকে কখন জানাইবেন না যে ইনি তাঁহার স্ত্রী ।”

“আচার্য্য সেইরূপ অঙ্গীকার করিলেন । সেই পর্যান্ত তিনি তাহাকে পরিবারস্থ করিয়া, প্রতিপালন করিয়া, ভোগ্যের সঙ্গে বিবাহের কথা লুকাইয়াছেন ।”

প । এখন সে কত্য়া কোথায় ?

ম । আমিই কেশবের মেয়ে—জনার্দন শর্মা তাঁহার আচার্য্য ।

পশুপতি চিত্ত হারাইলেন ; তাঁহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল । তিনি বাঙনিপ্পত্তি না করিয়া প্রতিমাসমীপে সার্বাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন । পরে গাত্রোথান করিয়া মনোরমাকে বক্ষে ধারণ করিতে গেলেন । মনোরমা পূর্ববৎ সরিয়া দাঁড়াইল । কহিল,

“এখন নয়—আরও কথা আছে ।”

প। মনোরমা—রাক্ষসী! এতদিন কেন আমাকে এ অন্ধকারে রাখিয়াছিলে ?

ম। কেন! তুমি কি আমার কথায় বিশ্বাস করিতে ?

প। মনোরমা, তোমার কথায় কবে আমি অশ্বিনাস করিয়াছি ? আর যদিই আমার অপ্রত্যয় জন্মিত, তবে আমি জনার্দন শর্মা কে জিজ্ঞাসা করিতে পারিতাম ।

ম। জনার্দন কি তাহা প্রকাশ করিতেন ? তিনি শিষ্যের নিকট সত্যে বদ্ধ আছেন ।

প। তবে তোমার কাছে প্রকাশ করিলেন কেন ?

ম। তিনি আমার নিকট প্রকাশ করেন নাই । একদিন গোপনে ব্রাহ্মণীর নিকট প্রকাশ করিতেছিলেন । আমি দৈবাৎ গোপনে শুনিয়াছিলাম । আরও আমি বিধবা বলিয়া পরিচিতা । তুমি আমার কথায় প্রত্যয় করিলে লোকে প্রত্যয় করিবে কেন ? তুমি লোকের কাছে নিন্দনীয় না হইয়া কি প্রকারে আমাকে গ্রহণ করিতে ?

প। আমি সকল লোককে একত্র করিয়া তাহা-দিগকে বুঝাইয়া বলিতাম ।

ম। ভাল, তাহাই হউক,—জ্যোতির্বিদের গণনা ?

প। আমি গ্রহশাস্তি করাইতাম । ভাল, যাহা

হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে যদি আমি রত্ন পাইয়াছি, তবে আর তাহা গলা হইতে নামাইব না। তুমি আর আমার ধর ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না।

মনোরমা কহিল, “এ ধর ছাড়িতে হইবে। পশু-পতি! আমি যাহা আজি বলিতে আসিয়াছিলাম, তাহা বলি শুন। এ ধর ছাড়। তোমার রাজ্যলাভের দুরাশা ছাড়। প্রভুর অহিতচেষ্টা ছাড়। এ দেশ ছাড়িয়া চল, আমরা কাশীধামে যাত্রা করি। সেইখানে আমি তোমার চরণসেবা করিয়া জন্ম সার্থক করিব। যে দিন আমাদের আয়ুঃশেষ হইবে, একত্রে পরমধামে যাত্রা করিব। যদি ইহা স্বীকার কর—আমার ভক্তি অচলা থাকিবে। নহিলে—”

প। নহিলে কি?

মনোরমা তখন উন্নতমুখে, সবাস্পলোচনে, দেবী-প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া যুক্তকরে, গদগদকণ্ঠে কহিল, “নহিলে, দেবীসমক্ষে শপথ করিতেছি, তোমার আমার এই সাক্ষাৎ, এ জন্মে আর সাক্ষাৎ হইবে না।”

পশুপতিও দেবীর সমক্ষে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন,

“মনোরমা—আমিও শপথ করিতেছি, আমার জীবন

বিহঙ্গী পিঞ্জরে ।

থাকিতে তুমি আমার বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না । মনোরমা, আমি যে পথে পদার্পণ করিয়াছি, সে পথ হইতে ফিরিবার উপায় থাকিলে আমি ফিরিতাম— তোমাকে লইয়া সৰ্ব্বত্যাগী হইয়া কাশীযাত্রী করিতাম । কিন্তু অনেক দূর গিয়াছি । আর ফিরিবার উপায় নাই— যে গ্রহি বাঁধিয়াছি তাহা আর খুলিতে পারি না— শ্রোতে ভেলা ভাসাইয়া আর ফিরাইতে পারি না । যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়াছে । তাই বলিয়া কি আমার পরমশ্রমে আমি বঞ্চিত হইব ? তুমি আমার স্ত্রী, আমার কপালে যাই থাকুক, আমি তোমাকে গৃহিণী করিব । তুমি ক্ষণেক অপেক্ষা কর—আমি শীঘ্র আসিতেছি ।” এই বচনটা পশুপতি মন্দির হইতে নিজ্জান্ত হইয়া গেলেন । মনোরমার চিত্তে সংশয় জন্মিল । সে স্তম্ভিতাস্তঃকরণে কিয়ৎক্ষণ মন্দিরমধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল । আর একবার পশুপতির নিকট বিদায় না লইয়া যাইতে পারিল না ।

অল্পকাল পরেই পশুপতি ফিরিয়া আসিলেন । বলিলেন, “প্রাণাধিকা ! আজ আর তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবে না । আমি সকল দ্বার রুদ্ধ করিয়া আসিয়াছি ।”

মনোরমা বিহঙ্গী পিঞ্জরে বদ্ধ হইল ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

যবনদূত—যমদূত বা ।

বেলা প্রহরেকের সময় নগরবাসীরা বিস্মিতলোচনে দেখিল, কোন অপরিচিতজাতীয় সম্প্রদায় অশ্বারোহী পুরুষ রাজপথ অতিবাহিত করিয়া রাজভবনাভিমুখে যাইতেছে । তাহাদিগের আকারেঙ্গিত দেখিয়া নবদ্বীপবাসীরা ধস্তবাস্ত করিতে লাগিল । তাহাদিগের শরীর আয়ত, দীর্ঘ অথচ পুষ্ট ; তাহাদিগের বর্ণ তপ্তকান্ধন-সন্নিভ ; তাহাদিগের মুখমণ্ডল বিস্তৃত, ঘনকৃষ্ণশ্ৰুজি-বিভূষিত ; নয়ন প্রশস্ত, জ্বালাবিশিষ্ট । তাহাদিগের পরিচ্ছদ অনর্থক চাকচিক্যবিবর্জিত ; তাহাদিগের যোদ্ধ-বেশ ; সর্বত্র প্রহরণজালগণ্ডিত, লোচনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা । আর যে সকল সিদ্ধপার-জাত অশ্বপৃষ্ঠে তাহারা আরোহণ করিয়া যাইতেছিল, তাহারাই বা কি মনোহর ! পর্বত-শিলাথণ্ডের স্থায় বৃহদাকার, বিমার্জিতদেহ, বক্রগ্রীব, বন্ধারোধ-অসহিষ্ণু, তেজোগর্বে নৃত্যশীল ! আরোহীরা কি বা তচ্চালন-কৌশলী—অবলীলাক্রমে সেই রুদ্ধবায়ু-

তুল্য তেজঃপ্রথর অশ্ব সকল দান্নিত করিতেছে। দেখিয়া গৌড়বাসীরা বহুতর প্রশংসা করিল।

সপ্তদশ অশ্বারোহী দূত প্রতিজ্ঞায় অধরৌষ্ঠ সংশ্লিষ্ট করিয়া নীরবে রাজপুরাভিমুখে চলিল। *কৌতূহলবশতঃ কোন নগরবাসী কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, সমভিব্যাহারী একজন ভাষাজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া দিতে লাগিল, “ইহারা যবন রাজার দূত।” এই বলিয়া ইহারা প্রান্তপাল ও কোষ্ঠপালদিগের নিকট পরিচয় দিয়াছিল—এবং পশুপতির আজ্ঞাক্রমে সেই পরিচয়ে নির্বিঘ্নে নগরমধ্যে প্রবেশ লাভ করিল।

সপ্তদশ অশ্বারোহী রাজদ্বারে উপনীত হইল। বৃদ্ধ-রাজার শৈথিল্যে আর পশুপতির কৌশলে রাজপুরী প্রায় রক্ষকহীন। রাজসভা ভঙ্গ হইয়াছিল—পুরীমধ্যে কেবল পৌরজন ছিল মাত্র—অল্পসংখ্যক দৌবারিক দ্বার রক্ষা করিতেছিল। একজন দৌবারিক জিজ্ঞাসা করিল, “তোমরা কি জন্ত আসিয়াছ ?”

যবনেরা উত্তর করিল, “আমরা যবন রাজপ্রতিনিধির দূত ; গৌড়রাজের সহিত সাক্ষাৎ করিব।”

দৌবারিক কহিল, “মহারাজাধিরাজ গোড়েশ্বর এক্ষণে অন্তঃপুরে গমন করিয়াছেন—এখন সাক্ষাৎ হইবে না।”

যবনেরা নিষেধ না শুনিয়া যুক্ত দ্বারপথে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। সর্বাগ্রে একজন ধর্মকায়, দীর্ঘ-বাহু কুরূপ যবন। হৃভাগ্যবশতঃ দৌবারিক তাহার গতিরোধজন্য শূঁহস্তে তাহার সন্মুখে দাঁড়াইল। কহিল, “ফের—নচেৎ এখনই মারিব।”

“আপনিই তবে মর!” এই বলিয়া ক্ষুদ্রাকার যবন দৌবারিককে নিজকরস্থ তরবারে ছিন্ন করিল। দৌবারিক প্রাণত্যাগ করিল। তখন আপন সঙ্গীদিগের মুখাবলোকন করিয়া ক্ষুদ্রকায় যবন কহিল, “এক্ষণে আপন আপন কার্য্য কর।” অমনি বাক্যহীন ষোড়শ অশ্বারোহীদিগের মধ্য হইতে ভীষণ জয়ধ্বনি সমুথিত হইল। তখন সেই ষোড়শ যবনের কটিবন্ধ হইতে ষোড়শ অসিফলক নিষ্কোষিত হইল—এবং অশনিসম্পাতসদৃশ তাহারা দৌবারিকদিগকে আক্রমণ করিল। দৌবারিকেরা বণসজ্জায় ছিল না—অকস্মাৎ নিরুদ্যোগে আক্রান্ত হইয়া আত্মরক্ষার কোন চেষ্টা করিতে পারিল না—মুহূর্ত্তমধ্যে সকলেই নিহত হইল।

ক্ষুদ্রকায় যবন কহিল, “যেখানে যাহাকে পাও, বধ কর। পুরী অরক্ষিতা—বৃদ্ধ রাজাকে বধ কর।”

তখন যবনেরা পুরমধ্যে তাড়িতের ন্যায় প্রবেশ করিয়া

বালবুদ্ধবনিতা পৌরজন যেখানে বাঁহাকে দেখিল তাহাকে অসি দ্বারা ছিন্নমস্তক, অথবা শূলাগ্রে বিদ্ধ করিল ।

পৌরজন তুমুল আৰ্ত্তনাদ করিয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল । সেই ঘোর আৰ্ত্তনাদ, অন্তঃপুরে যথা বৃদ্ধ রাজা ভোজন করিতেছিলেন, তথা প্রবেশ করিল । তাঁহার মুখ শুকাইল । জিজ্ঞাসা করিলেন; “কি ঘটিয়াছে—যবন আসিয়াছে ?”

পলায়নতৎপর পৌরজনেরা কহিল, “যবন সকলকে বধ করিয়া আপনাকে বধ করিতে আসিতেছে ।”

কবলিত অনগ্রাস রাজার মুখ হইতে পড়িয়া গেল । তাঁহার শুষ্কশরীর জনশ্রোতঃপ্রহত বেতসের ঞ্চার কাঁপিতে লাগিল । নিকটে রাজমহিষী ছিলেন—রাজা ভোজন-পাত্রে উপর পড়িয়া যান দেখিয়া, মহিষী তাঁহার হস্ত ধরিলেন ; কহিলেন,

“চিন্তা নাই—আপনি উঠুন ।” এই বলিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া তুলিলেন । রাজা কলের পুত্তলিকার ঞ্চার দাঁড়াইয়া উঠিলেন ।

মহিষী কহিলেন, “চিন্তা কি ? নৌকায় সকল দ্রব্য গিয়াছে, চলুন, আমরা খিড়কী দ্বার দিয়া নোণারগা বাত্রা করি ।”

এই বলিয়া মহিষী রাজার অধোত হস্ত ধারণ করিয়া খিড়কীদারপথে সুবর্ণগ্রাম যাত্রা করিলেন। সেই রাজ-কুলকলঙ্ক, অসমর্থ রাজার সঙ্গে গোড়রাজ্যের রাজলক্ষ্মীও যাত্রা করিলেন।

ষোড়শ সহস্র লইয়া মর্কটাকার বখতিয়ার খিলিজি গোড়েশ্বরের রাজপুরী অধিকার করিল।

ষষ্টি বৎসর পরে যবন-ইতিহাসবেত্তা মিন্‌হাজ্‌উদ্দীন এইরূপ লিখিয়াছিলেন। ইহার কতদূর সত্য, কতদূর মিথ্যা, তাহা কে জানে। যখন মনুষ্যের লিখিত চিত্রে সিংহ পরাজিত, মনুষ্য সিংহের অপমানকর্তা স্বরূপ চিত্রিত হইয়াছিল, তখন সিংহের হস্তে চিত্রফলক দিলে কিরূপ চিত্র লিখিত হইত? মনুষ্য মূষিকতুল্য প্রতীয়মান হইত সন্দেহ নাই। মন্দভাগিনী বঙ্গভূমি সহজেই হুর্দলা, আবার তাহাতে শত্রুহস্তে চিত্রফলক।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

জাল ছিঁড়িল।

গৌড়েশ্বরপুরে অধিষ্ঠিত হইয়াই বখতিয়ার খিলিজি ধর্ম্মাধিকারের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। ধর্ম্মাধিকারের সহিত সাক্ষাতের অভিলাষ জানাইলেন। তাঁহার সহিত যবনের সন্ধিনিবন্ধন হইয়াছিল, তাহার ফলোৎপাদনের সময় উপস্থিত।

পশুপতি ইষ্টদেবীকে প্রণাম করিয়া, কুপিতা মনোরমার নিকট বিদায় লইয়া, কদাচিৎ উল্লসিত—কদাচিৎ শঙ্কিত চিত্তে যবনসর্বাঙ্গে উপস্থিত হইলেন। বখতিয়ার খিলিজি গাত্রোথান করিয়া সাদরে তাঁহার অভিবাদন করিলেন এবং কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। পশুপতি রাজভৃত্যবর্গের রক্তনদীতে চরণ প্রক্ষালন করিয়া আসিয়াছেন, 'সহসা' কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। বখতিয়ার খিলিজি তাঁহার চিত্তের ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন,

“পণ্ডিতবর ! রাজসিংহাসন আরোহণের পথ কুম্ভাবৃত্ত

নহে । এ পথে চলিতে গেলে, বন্ধুবর্গের অস্থিমুণ্ড সর্বদা পদে বিদ্ধ হয় ।”

পশুপতি কহিলেন, “সত্য । কিন্তু যাহারা বিরোধী, তাহাদিগেরই বধ আবশ্যিক । ইহারা নির্বিরোধী ।”

বখ্‌তিরার কহিলেন, “আপনি কি শোণিতপ্রবাহ দেখিয়া, নিজ অঙ্গীকার স্বরণে অসুখী হইতেছেন ?”

পশুপতি কহিলেন, “যাহা স্বীকার করিয়াছি, তাহা অবশ্য করিব । মহাশয়ও যে তদ্রূপ করিবেন, তাহাতে আমার কোন সংশয় নাই ।”

বখ্‌ । কিছুমাত্র সংশয় নাই । কেবলমাত্র আমাদিগের এক যাক্সা আছে ।

প । আজ্ঞা করুন ।

ব । কুতব্‌উদ্দীন গোড়শাসনভার আপনার প্রতি অর্পণ করিলেন । আজ হইতে আপনি বঙ্গে রাজপ্রতিনিধি হইলেন । কিন্তু যবন-সম্রাটের সঙ্কল্প এই যে, ইসলামধর্মাবলম্বী ব্যতীত কেহ তাঁহার রাজকার্যে সংলিপ্ত হইতে পারিবে না । আপনাকে ইসলামধর্ম অবলম্বন করিতে হইবে ।

পশুপতির মুখ শুকাইল । তিনি কহিলেন, “সন্ধির সময়ে এরূপ কোন কথা হয় নাই ।”

ব। 'যদি না হইয়া থাকে,, তবে সেটা ভ্রান্তিমাত্র। আর এ কথা উত্থাপিত না হইলেও আপনার স্তায় বুদ্ধিমান ব্যক্তি দ্বারা অনায়াসেই অনুমিত হইয়া থাকিবে। কেন না এমন কখনও সম্ভবে না যে, মুসলমানেরা বাঙ্গালা জয় করিয়াই আবার হিন্দুকে রাজ্য দিবে।

প। আমি বুদ্ধিমান বনিয়া আপনার নিকট পরিচিত হইতে পারিলাম না।

ব। না বুঝিয়া থাকেন এখন বুঝিলেন; আপনি যখনধর্ম অবলম্বনে স্থিরসঙ্কল্প হউন।

প। (সদপে) আমি স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছি যে, যখন সম্রাটের সাম্রাজ্যের জন্তও সনাতন ধর্ম ছাড়িয়া নরকগামী হইব না।

ব। ইহা আপনার লম। যাহাকে সনাতন ধর্ম বলিতেছেন, সে ভূতের পূজা মাত্র। কোরাণ-উক্ত ধর্মই সত্য ধর্ম। মহম্মদ ভজিয়া ইহকাল পরকালের মঙ্গল সাধন করুন।

পশুপতি যবনের শঠতা বুঝিলেন। তাহার অভিপ্রায় এই মাত্র যে, কার্যসিদ্ধি করিয়া নিরঙ্ক সন্ধি ছলক্রমে ভঙ্গ করিবে। আরও বুঝিলেন, ছলক্রমে না পারিলে, বলক্রমে করিবে। অতএব কপটের সহিত কাপটা

অবলম্বন না করিয়া দর্প করিয়া ভাল করেন নাই। তিনি ক্রণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন, “যে আজ্ঞা। আমি আজ্ঞানুবর্তী হইব।”

বখতিয়ারও তাঁহার মনের ভাব বুঝিলেন। বখতিয়ার যদি পশুপতির অপেক্ষা চতুর না হইতেন, তবে এত সহজে গোড়াজয় করিতে পারিতেন না। বঙ্গভূমির অদৃষ্টে লিপি এই যে, ‘এ ভূমি যুদ্ধে জিত হইবে না; চাতুর্যেই ইহার জয়। চতুর ক্লাইব সাহেব ইহার দ্বিতীয় পরিচয়স্থান।

বখতিয়ার কহিলেন, “ভাল, ভাল। আজ আনাদিগের শুভ দিন। একরূপ কার্যে বিলম্বের প্রয়োজন নাই। আমাদিগের পুরোহিত উপস্থিত, এখনই আপনাকে ইসলামের ধর্মে দীক্ষিত করিবেন।”

পশুপতি দেখিলেন, সর্বনাশ! বলিলেন, একবার মাত্র অবকাশ দিউন, পরিবারগণকে লইয়া আমি, সপরিবারে একেবারে দীক্ষিত হইব।”

বখতিয়ার কহিলেন, “আমি তাঁহাদিগকে আনিতে লোক পাঠাইতেছি। আপনি এই প্রহরীর সঙ্গে গিয়া বিশ্রাম করুন।”

প্রহরী আসিয়া পশুপতিকে ধরিল। পশুপতি

ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, “সে, কি? আমি কি বন্দী হইলাম?”

বৎতিয়ার কহিলেন, “আপাততঃ তাহাই বটে!”

পশুপতি রাজপুরীমধ্যে নিষ্কৃত হইলেন। উর্গনাভের জাল ছিঁড়িল—সে জালে কেবল স্বয়ং জড়িত হইল।

আমরা পাঠক মহাশয়ের নিকট পশুপতিকে বুদ্ধিমান বলিয়া পরিচিত করিয়াছি। পাঠক মহাশয় বলিবেন, যে ব্যক্তি শত্রুকে এতদূর বিশ্বাস করিল, সহায়হীন হইয়া তাহাদিগের অধিকৃত পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার চতুরতা কোথায়? কিন্তু বিশ্বাস না করিয়া কি করেন। এ বিশ্বাস না করিলে যুদ্ধ করিতে হয়। উর্গনাভ জাল পাতে, যুদ্ধ করে না।

সেই দিন রাত্ৰিকালে মহাবন হইতে বিংশতি সহস্র যবন আসিয়া নবদ্বীপ প্লাবিত করিল। নবদ্বীপ-জয় সম্পন্ন হইল। যে সূর্য্য সেই দিন অস্ত গিয়াছে, আর তাহার উদয় হইল না। আর কি উদয় হইবে না? উদয় অস্ত উভয়ই ত স্বাভাবিক নিয়ম!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

পিঞ্জর ভাঙ্গিল ।

যতক্ষণ পশুপতি গৃহে ছিলেন, ততক্ষণ তিনি মনোরমাকে নয়নে নয়নে রাখিয়াছিলেন । যখন তিনি বনদর্শনে গেলেন, তখন তিনি গৃহের সকল দ্বার রুদ্ধ করিয়া শান্তশীলকে গৃহরক্ষায় রাখিয়া গেলেন ।

পশুপতি যাইবামাত্র, মনোরমা পলায়নের উদ্যোগ করিতে লাগিল । গৃহের কক্ষে কক্ষে অনুসন্ধান করিতে লাগিল । পলায়নের উপযুক্ত কোন পথ মুক্ত দেখিল না । অতি উর্দ্ধে কতকগুলি গবাক্ষ ছিল, কিন্তু তাহা ছরারোহ ; তাহার মধ্য দিয়া মনুষ্যশরীর নির্গত হইবার সম্ভাবনা ছিল না ; আর তাহা ভূমি হইতে এত উচ্চ যে, তথা হইতে লক্ষ দিয়া ভূমিতে পড়িলে অস্থি চূর্ণ হইবার সম্ভাবনা । মনোরমা উন্মাদিনী ; সেই গবাক্ষপথেই নিষ্ক্রান্ত হইবার মানস করিল ।

অতএব পশুপতি যাইবার ক্ষণকাল পরেই, মনোরমা পশুপতির শয্যাগৃহে পালঙ্কের উপর আরোহণ

করিল । পালক হইতে গবাক্ষারোহণ সুলভ হইল । পালক হইতে গবাক্ষ অবলম্বন করিয়া, মনোরমা গবাক্ষ-রন্ধু দিয়া প্রথমে দুই হস্ত, পশ্চাৎ মস্তক, পরে বক্ষ পর্য্যন্ত বাহির করিয়া দিল । গবাক্ষনিকটে উদ্যানস্থ একটা আম্রবৃক্ষের ক্ষুদ্র শাখা দেখিল । মনোরমা তাহা ধারণ করিল ; এবং তখন পশ্চাচ্ছাগ গবাক্ষ হইতে বহিস্কৃত করিয়া, শাখাবলম্বনে ঝুলিতে লাগিল । কোমল শাখা তাঁহার ভরে নমিত হইল ; তখন ভূমি তাঁহার চরণ হইতে অনতিদূরবর্তী হইল । মনোরমা শাখা ত্যাগ করিয়া অবলীলাক্রমে ভূতলে পড়িল । এবং তিলমাত্র অপেক্ষা না করিয়া জনার্দনের গৃহাভিমুখে চলিল ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

যবনবিপ্লব ।

সেই নিম্নাথে নবদ্বীপ নগর বিজয়োন্নত যবনসেনার নিম্পীড়নে, বাতাসস্তাড়িত তরঙ্গোৎক্ষেপী সাগর সদৃশ

চঞ্চল হইয়া উঠিল। রাজপথ, ভূরি ভূরি অশ্বারোহিগণে, ভূরি ভূরি পদাতিদলে, ভূরি ভূরি খড়্গী, ধানুকী, শূলী-সমূহসমারোহে, আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সেনাবলহীন রাজধানীর নাগরিকেরা ভীত হইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল; দ্বার রুদ্ধ করিয়া সতয়ে ইষ্টনাম জপ করিতে লাগিল।

যবনেরা রাজপথে যে দুই একজন হতভাগ্য আশ্রয়-হীন ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হইল, তাহাদিগকে শূলবিদ্ধ করিয়া রুদ্ধদ্বার ভবন সকল আক্রমণ করিতে লাগিল। কোথায়ও বা দ্বার ভংগ করিয়া, কোথায়ও বা প্রাচীর উল্লেখন করিয়া, কোথায়ও বা শঠতা পূর্বক ভীত গৃহস্থকে জীবনাশা দিয়া গৃহপ্রবেশ করিতে লাগিল। গৃহ প্রবেশ করিয়া, গৃহস্থের সর্বস্বাপহরণ, পশ্চাৎ স্ত্রী পুরুষ, বৃদ্ধ, বনিতা, বালক সকলেরই শিরশ্ছেদ, ইহাই নিয়মপূর্বক করিতে লাগিল। কেবল বৃত্তীর পক্ষে স্বতন্ত্র নিয়ম।

শোণিতে গৃহস্থের গৃহ সকল প্লাবিত হইতে লাগিল। শোণিতে রাজপথ পঙ্কিল হইল। শোণিতে যবনসেনা রক্তচিত্রময় হইল। অপহৃত দ্রব্যজাতের ভারে অশ্বের পৃষ্ঠ এবং মনুষ্যের স্বরূপ পীড়িত হইতে লাগিল। শূলাগ্রে বিদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণের মুণ্ড সকল ভীষণভাবে বাক্ত করিতে

লাগিল । ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত অশ্বের গলদেশে হুলিতে লাগিল । সিংহাসনস্থ শালগ্রামশিলা সকল যবন-পদাঘাতে গড়াইতে লাগিল ।

ভয়ানক শব্দে নৈশাকাশ পরিপূর্ণ হইতে লাগিল । অশ্বের পদধ্বনি, সৈনিকের কোলাহল, হস্তীর বৃৎহিত, যবনের জয়শব্দ, তদুপরি পীড়িতের আর্তনাদ । মাতার রোদন, শিশুর রোদন ; বৃদ্ধের কৰুণাকাজ্জা, যুবতীর কণ্ঠবিদার ।

যে বীর পুরুষকে মাধবাচার্য্য এত বত্নে যবনদমনার্থ নবদ্বীপে লইয়া আসিয়াছিলেন, এ সময়ে তিনি কোথা ?

এই ভয়ানক যবনপ্রলয়কালে, হেমচন্দ্র রণোন্মুখ নহেন । একাকী রণোন্মুখ হইয়া কি করিবেন ?

হেমচন্দ্র তখন আপন গৃহের শয়নমন্দিরে, শয্যোপরি শয়ন করিয়াছিলেন । নগরক্রমণের কোলাহল তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল । তিনি দিগ্বিজয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিসের শব্দ ?”

দিগ্বিজয় কহিল, “যবনসেনা নগর আক্রমণ করিয়াছে ।”

হেমচন্দ্র চমৎকৃত হইলেন । তিনি এ পর্য্যন্ত বধু-তির্য্যক কর্তৃক রাজপুরাধিকার এবং রাজার পলায়নের বৃত্তান্ত শুনে নাই । দিগ্বিজয় তদ্বিশেষ হেমচন্দ্রকে শুনাইল ।

হেমচন্দ্র কহিলেন, “নাগরিকেরা কি করিতেছে ?”

দি। যে পারিতেছে পলায়ন করিতেছে, যে না পারিতেছে সে প্রাণ হারাইতেছে।

হে। আশ্রয় গোড়ায় সেনা ?

দি। কাহার জন্ত যুদ্ধ করিবে ? রাজা ত পলাতক। স্ত্রীরাং তাহারা আপন আপন পথ দেখিতেছে।

হে। আমার অশ্রুসজ্জা কর।

দিগ্বিজয় বিস্মিত হইল, জিজ্ঞাসা করিল, “কোথায় যাইবেন ?”

হে। নগরে।

দি। একাকী ?

হেমচন্দ্র ক্রকুটী করিলেন। ক্রকুটী দেখিয়া দিগ্বিজয় ভীত হইয়া অশ্রুসজ্জা করিতে গেল।

হেমচন্দ্র তখন মহামূল্য রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া সুন্দর অশ্রুপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। এবং ভীষণ শূলহস্তে নিৰ্ঝরিণীশ্রেণিত জলবিষবৎ সেই অসীম যবন-সেনা-সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন।

হেমচন্দ্র দেখিলেন, যবনেরা যুদ্ধ করিতেছে না, কেবল অপহরণ করিতেছে। যুদ্ধজন্ত কেহই তাহাদিগের সম্মুখীন হয় নাই, স্ত্রীরাং যুদ্ধে তাহাদিগেরও মন ছিল

যবনবিপ্লব ।

না। বাহাদিগের অপহরণ করিতেছিল, তাহাদিগকেই, অপহরণকালে বিনা যুদ্ধে মারিতেছিল। সুতরাং যবনেরা দলবদ্ধ হইয়া হেমচন্দ্রকে নষ্ট করিবার কোন উদ্যোগ করিল না। যে কোন যবন তৎকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাঁহার সহিত একা যুদ্ধোদ্ভম করিল, সে তৎক্ষণাৎ মরিল।

হেমচন্দ্র বিরক্ত হইলেন। তিনি যুদ্ধাকাজ্ঞার আসিয়াছিলেন, কিন্তু যবনেরা পূর্বেই বিজয়লাভ করিয়াছে, অর্থসংগ্রহ ত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত রীতিমত যুদ্ধ করিল না। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, “একটা একটা করিয়া গাছের পাতা ছিঁড়িয়া কে অরণ্যকে নিষ্পত্ত করিতে পারে? একটা একটা যবন মারিয়া কি করিব? যবন যুদ্ধ করিতেছে না—যবনবধেই বা কি সুখ? বরং গৃহীদের রক্ষার সাহায্যে মন দেওয়া ভাল।” হেমচন্দ্র তাহাই করিতে লাগিলেন, কিন্তু বিশেষ ক্লতকার্য্য হইতে পারিলেন না। দুইজন যবন তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া, অপর যবনে সেই অবসরে গৃহস্থদিগের সর্বস্বান্ত করিয়া চলিয়া যায়। বাহাই হউক, হেমচন্দ্র যথাসাধ্য পীড়িতের উপকার করিতে লাগিলেন। পথপার্শ্বে এক কুটার মধ্য হইতে হেমচন্দ্র আর্তনাদ শ্রবণ করিলেন। যবনকর্তৃক

আক্রান্ত ব্যক্তির আর্ন্তনাদ বিবেচনা করিয়া হেমচন্দ্র গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন ।

দেখিলেন গৃহমধ্যে যবন নাই । কিন্তু গৃহমধ্যে যবন-দোরাখোর কিছু সকল বিদ্যমান রহিয়াছে । দ্রব্যাদি প্রায় কিছুই নাই. যাহা আছে তাহার ভগ্নাবস্থা, আর এক ব্রাহ্মণ আহত অবস্থায় ভূমে পড়িয়া আর্ন্তনাদ করিতেছে । সে এ প্রকার গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে যে মৃত্যু আসন্ন । হেমচন্দ্রকে দেখিয়া সে যবনভ্রমে কহিতে লাগিল ।

“আইস—প্রহার কর—শীঘ্র মরিব—মার—আমার মাথা লইয়া সেই ব্রাহ্মণীকে দিও—আঃ—প্রাণ যাব—জল ! জল ! কে জল দিবে !”

হেমচন্দ্র কহিলেন, “তোমার ঘরে জল আছে ?”

ব্রাহ্মণ কাতরোক্তিতে কহিতে লাগিল, “জানি না—মনে হয় না—জল ! জল ! পিশাচী !—সেই পিশাচীর জন্ত প্রাণ গেল !”

হেমচন্দ্র কুটীরমধ্যে অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন, এক কলসে জল আছে । পাত্রাভাবে পত্রপুটে তাহাকে জল দান করিলেন । ব্রাহ্মণ কহিল, “না !—না ! জল খাইব না ! যবনের জল খাইব না ।” হেমচন্দ্র কহিলেন, “আমি

যবন নহি, আমি হিন্দু—আমার হাতের জল পান করিতে পার। আমার কথায় বুঝিতে পারিতেছ না ?”

ব্রাহ্মণ জল পান করিল। হেমচন্দ্র কহিলেন, “তোমার আর কি উপকার করিব ?”

ব্রাহ্মণ কহিল, “আর কি করিবে ? আর কি ? আমি মরি ! মরি ! যে মরে তাহার কি করিবে ?”

হেমচন্দ্র কহিলেন, “তোমার কেহ আছে ? তাহাকে তোমার নিকট রাখিয়া যাইব ?”

ব্রাহ্মণ কহিল, “আর কে—কে আছে ? ঢের আছে । তার মধ্যে সেই ব্রাহ্মসী ! সেই ব্রাহ্মসী—তাহাকে—বলিও—বলিও আমাব অপ—অপরাধের প্রতিশোধ হইয়াছে ।”

হেমচন্দ্র । কে সে ? কাহাকে বলিও ?

ব্রাহ্মণ কহিতে লাগিল, “কে সে পিশাচী ! পিশাচী চেন না ? পিশাচী মৃগালিনী—মৃগালিনী ! মৃগালিনী—পিশাচী ।”

ব্রাহ্মণ অধিকতর আর্তনাদ করিতে লাগিল ।—হেমচন্দ্র মৃগালিনীর নাম শুনিয়া চমকিত হইলেন । দ্বিচ্ছানা করিলেন, “মৃগালিনী তোমার কে হয় ?”

ব্রাহ্মণ কহিলেন, “মৃগালিনী কে হয় ? কেহ না—আমার ঘন ।”

হেমচন্দ্র । মৃগালিনী তোমার কি করিয়াছে ?

ব্রাহ্মণ । কি করিয়াছে ?—কিছু না—আমি—আমি
তার দুর্দশা করিয়াছি, তাহার প্রতিশোধ হইল—

হে । কি দুর্দশা করিয়াছ ?

ব্রা । আর কথা কহিতে পারি না, জল দাও ।

হেমচন্দ্র পুনর্বার তাহাকে জলপান করাইলেন ।
ব্রাহ্মণ জলপান করিয়া হির হইলে হেমচন্দ্র তাহাকে
জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার নাম কি ?”

ব্রা ব্যোমকেশ ।

হেমচন্দ্রের চক্ষুঃ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল ।
দস্তে অধর দংশন করিলেন । করস্থ শূল দৃঢ়তর মুষ্টিবদ্ধ
করিয়া ধরিলেন । আবার তখনই শান্ত হইয়া কহিলেন,

“তোমার নিবাস কোথা ?”

ব্রা । গোড়—গোড় জানি না ? মৃগালিনী আমাদের
বাড়ীতে থাকিত ।

‘ হে ! তার পর ?

ব্রা । তার পর—তার পর আর কি ? তার পর
আমার এই দশা—মৃগালিনী পাপিষ্ঠা ; বড় নির্দয়—
আমার প্রতি ফিরিয়াও চাহিল না । ” রাগ করিয়া আমার
পিতার নিকট আমি তাহার নামে মিছা কলঙ্ক রটাইলাম ।

পিতা তাহাকে বিনা দোষে তাড়াইয়া দিলেন । রাক্ষসী—
রাক্ষসী আমাদের ছেড়ে গেল । .

হে । তবে তুমি তাহাকে গালি দিতেছ কেন ?

ব্রা । কেন ?—কেন ? গালি—গালি পাই? মুণা-
লিনী আমাকে কিরিয়া দেখিত না—আমি—আমি
তাহাকে দেখিয়া জীবন—জীবন ধারণ করিতাম । সে
চলিয়া আসিল, সেই—সেই অবধি আমার সর্বস্ব ত্যাগ,
তাহার জন্ত কোন্ দেশে—কোন্ দেশে না গিয়াছি—
কোণায় পিশাচীর সন্ধান না করিয়াছি । গিরিজায়া—
ভিখারীর মেয়ে—তার আয়ি বলিয়া দিল—নবদ্বীপে আসি-
য়াছে—নবদ্বীপে আসিলাম সন্ধান নাই । যবন—যবন-
হস্তে মরিলাম, রাক্ষসীর জন্ত মরিলাম—দেখা হইলে
বলিও—আমার পাপের ফল কলিল ।

আর ব্যোমকেশের কথা মরিল না । সে পরিশ্রমে
একেবারে নিজ্জীব হইয়া পড়িল । নির্বাণোগুথ দীপ
নিবিল ! ঋণপরে বিকট মুখভঙ্গী করিয়া ব্যোমকেশ
প্রাণত্যাগ করিল ।

হেমচন্দ্র আর দাঁড়াইলেন না । . আর যবনবধ
করিলেন না—কোন মতে পথ করিয়া গৃহাভিমুখে
চলিলেন ।

সর্বম পরিচ্ছেদ

মৃগালিনীর সুখ কি ?

যেখানে হেমচন্দ্র তাঁহাকে সোপানপ্রস্তুতরাঘাতে ব্যথিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন—মৃগালিনী এখনও সেইখানে। পৃথিবীতে যাইবার আর স্থান ছিল না—মর্কটসমান হইয়াছিল। নিশা প্রভাতা হইল, গিরিজায়া বস কিছু বলিলেন—মৃগালিনী কোন উত্তর দিলেন না, অদোবদনে বসিয়া রহিলেন। স্নানাহারের সময় উপস্থিত হইল—গিরিজায়া তাঁহাকে জলে নামাইয়া স্নান করাইল। স্নান করিয়া মৃগালিনী আর্দ্রবসনে সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন। গিরিজায়া স্বয়ং ক্ষুধাতুরা হইল—কিন্তু গিরিজায়া মৃগালিনীকে উঠাইতে পারিল না—সাহস করিয়া বার বার বলিতেও পারিল না। স্মৃতরাং নিকটস্থ বন হইতে কিঞ্চিৎ ফলমূল সংগ্রহ করিয়া ভোজন জন্য মৃগালিনীকে দিল। মৃগালিনী তাহা স্পর্শ করিলেন মাত্র। প্রসাদ গিরিজায়া ভোজন করিল—ক্ষুধার অক্ষু-স্রোধে মৃগালিনীকে ত্যাগ করিল না।

এইরূপে পূর্বাচলের সূর্য মধ্যাকাশে, মধ্যাকাশের সূর্য পশ্চিমে গেলেন। সন্ধ্যা হইল। গিরিজায়া দেখিল যে, তখনও মৃগালিনী গৃহে প্রত্যাগমন করিবার লক্ষণ প্রকাশ করিতেছেন না। গিরিজায়া বিশেষ চঞ্চলা হইল। পূর্বরাতে জাগরণ গিয়াছে—এ রাতেও জাগরণের আকার। গিরিজায়া কিছু বলিল না—বৃক্ষপল্লব সংগ্রহ করিয়া সোপানোপরি আপন শয্যা রচনা করিল। মৃগালিনী তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া কহিলেন, “তুমি ঘরে গিয়া শোও।”

গিরিজায়া মৃগালিনীর কথা শুনিয়া আনন্দিত হইল। বলিল, “একত্র বাইব।”

মৃগালিনী বলিলেন, “আমি বাইতেছি।”

গি। আমি ততক্ষণ অপেক্ষা করিব। ভিখারিণী হুইদও পাতা পাতিয়া শুইলে ক্ষতি কি ? কিন্তু সাহস পাই ত বলি—রাজপুত্রের সহিত এ জনের মত সম্বন্ধ ঘুচিল—তবে আর কার্তিকের হিমে আমরা কষ্ট পাই কেন ?

মৃ। গিরিজায়া—হেমচন্দ্রের সহিত এ জনে আমার সম্বন্ধ ঘুচিবে না। আমি কালিও হেমচন্দ্রের দাসী ছিলাম—আজিও তাঁহার দাসী।

গিরিজায়ার বড় রাগ হইল—সে উঠিয়া বসিল । বলিল, “কি ঠিকুরাণি ! তুমি এখনও বল—তুমি সেই পাষণ্ডের দাসী ! তুমি যদি তাঁহার দাসী—তবে আমি চলিলাম—আমার এখানে আর প্রয়োজন নাই ।”

মৃ । গিরিজায়া—যদি হেমচন্দ্র তোমাকে পীড়ন করিয়া থাকেন, তুমি স্থানান্তরে তাঁর নিন্দা করিও । হেমচন্দ্র আমার প্রতি কোন অত্যাচার করেন নাই—আমি কেন তাঁহার নিন্দা সহিব ? তিনি রাজপুত্র—আমার স্বামী ; তাঁহাকে পাষণ্ড বলিও না ।

গিরিজায়া আরও রাগ করিল । বহুযত্নরচিত পর্ণশয়া ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল । কহিল, “পাষণ্ড বলিব না ?—একবার বলিব ?” (বলিয়াই কতকগুলি শয্যাবিছাসের পল্লব সদর্পে জলে ফেলিয়া দিল) “একবার বলিব ?—দশবার বলিব” (আবার পল্লব নিক্ষেপ)—“শতবার বলিব” (পল্লব নিক্ষেপ)—“হাজারবার বলিব ।” এইরূপে সকল পল্লব জলে গেল । গিরিজায়া বলিতে লাগিল, “পাষণ্ড বলিব না ? কি দোষে তোমাকে তিনি এত তিরস্কার করিলেন ?”

মৃ । সে আমারই দোষ—আমি গুছাইয়া সকল কথা তাঁহাকে বলিতে পারি নাই—কি বলিতে কি বলিলাম ।

গি। ঠাকুরাণি ! আপনার কপাল টিপিয়া দেখ ।

মৃগালিনী ললাট স্পর্শ করিলেন ।

গি। কি দেখিলে ?

মৃ। বেদনা ।

গি। কেন হইল ?

মৃ। মনে নাই ।

গি। তুমি হেমচন্দ্রের সঙ্গে মাথা রাখিয়াছিলে—
তিনি ফেলিয়া দিয়া গিয়াছেন । পাতরে পড়িয়া তোমার
মাথায় লাগিয়াছে ।

মৃগালিনী ক্রণেক চিন্তা করিয়া দেখিলেন—কিছু মনে
পড়িল না । বলিলেন, “মনে হয় না ; বোধ হয়, আমি
আপনি পড়িয়া গিয়া থাকিব ।”

গিরিজায়া বিস্মিতা হইল । বলিল, “ঠাকুরাণি ! এ
সংসারে আপনি স্মৃতি ।”

মৃ। কেন ?

গি। আপনি রাগ করেন না ।

মৃ। আমিই স্মৃতি—কিন্তু তাহার জন্ম নহে ।

গি। তবে কিসে ?

মৃ। হেমচন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইয়াছি ।

নবম পরিচ্ছেদ ।

স্বপ্ন ।

গিরিজায়া কহিল, “গৃহে চল ।” মৃগালিনী বলিলেন, “নগরে এ কিসের গোলযোগ ?” তখন যবনসেনা নগর মন্থন করিতেছিল ।

তুমুল কোলাহল শুনিয়া উভয়ের শঙ্কা হইল । গিরিজায়া বলিল, “চল এই বেলা সতক হইয়া যাই ।” কিছু দুই জন রাজপথের নিকট পর্য্যন্ত গিয়া দেখিলেন, গমনের কোন উপায়ই নাই । অগত্যা প্রত্যাগমন করিয়া সরোবর-সোপানে বসিলেন । গিরিজায়া বলিল, “যদি এখানে উহারা আইসে ?”

• মৃগালিনী নীরবে রহিলেন । গিরিজায়া আপনিই বলিল, “বনের ছায়ামধ্যে এমন লুকাইব—কেহ দেখিতে পাইবে না ।”

উভয়ে আসিয়া সোপানোপরি উপবেশন করিয়া রহিলেন ।

মৃগালিনী ম্লানবদনে গিরিজায়াকে কহিলেন, “গিরি-
জায়া, বুঝি আমার যথার্থই সর্বনাশ উপস্থিত হইল ।”

গি । সে কি !

মৃ । এই এক অশারোহী গমন করিল ; ইনি হেম-
চন্দ্র । সখি—নগরে ঘোর যুদ্ধ হইতেছে ; যদি নিঃসহায়ে
পাল্লু সে যুদ্ধে গিয়া থাকেন—না জানি কি বিপদে
পড়িবেন !

গিরিজায়া কোন উত্তর করিতে পারিল না । তাহার
নিদ্রা আসিতেছিল । কিরংক্ষণ পরে মৃগালিনী দেখিলেন
যে, গিরিজায়া ঘুমাইতেছে ।

মৃগালিনীও, একে আহ্বাননিদ্রাভাবে দুর্বলা—তাহাতে
সমস্ত রাত্রিদিন মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন,
সুতরাং নিদ্রা ব্যতীত আর শরীর বহে না—তাহারও তন্দ্রা
আসিল । নিদ্রায় তিনি স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন । দেখি-
লেন যে, হেমচন্দ্র একাকী সর্বসমরে বিজয়ী হইয়াছেন ।
মৃগালিনী যেন বিজয়ী বীরকে দেখিতে রাজপথে দাঁড়াইয়া
ছিলেন । রাজপথে হেমচন্দ্রের অগ্রে, পশ্চাৎ, কত
চস্ত্রী, অশ্ব, পদাতি মাইতেছে । মৃগালিনীকে যেন সেই
সেনাতরঙ্গ ফেলিয়া দিয়া চরণদলিত করিয়া চলিয়া গেল—
তখন হেমচন্দ্র নিজ সৈন্যবী তুরঙ্গী হইতে অবতরণ করিয়া

তাঁহাকে হস্ত ধরিয়া উঠাইলেন। তিনি যেন হেমচন্দ্রকে বলিলেন, “প্রভু ! অনেক যন্ত্রণা পাইয়াছি ; দাসীকে আর ত্যাগ করিও না।” হেমচন্দ্র যেন বলিলেন, “আর কখন তোমার ত্যাগ করিব না।” সেই কণ্ঠস্বরে যেন—

তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, “আর কখনও তোমায় ত্যাগ করিব না” জাগ্রতেও এই কথা শুনিলেন। চক্ষু উন্মীলন করিলেন—কি দেখিলেন ? যাহা দেখিলেন, তাহা বিশ্বাস হইল না। আবার দেখিলেন সত্য ! হেমচন্দ্র সম্মুখে !—হেমচন্দ্র বলিতেছেন—“আর একবার ক্রমা কর—আর কখনও তোমায় ত্যাগ করিব না।”

নিরন্তিম্যানিনী, নির্লজ্জা মৃগালিনী আবার তাঁহার কণ্ঠলগ্না হইয়া স্বপ্নে মস্তক বক্ষা করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ ।

প্রেম—নানা প্রকার ।

আনন্দাশ্রুপ্লাবিত-বদনা মৃগালিনীকে হেমচন্দ্র হস্তে ধরিয়া উপবন-গৃহাভিমুখে লইয়া চলিলেন। হেমচন্দ্র

মৃগালিনীকে একবার অপমানিতা, তিরস্কৃত, ব্যথিতা করিয়া ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, আবার আপনি আসিয়াই তাঁহাকে হৃদয়ে গ্রহণ করিলেন,—ইহা দেখিয়া গিরিজায়া বিস্মিতা হইল, কিন্তু মৃগালিনী একটা কথাও জিজ্ঞাসা করিলেন না, একটা কথাও কহিলেন না। আনন্দপারিপ্লববিবশা হইয়া বসনে অশ্রুস্রুতি আবৃত করিয়া চলিলেন। গিরিজায়াকে ডাকিতে হইল না—সে স্বয়ং অন্তরে থাকিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

উপবনবাটিকায় মৃগালিনী আসিলে, তখন উভয়ে বহুদিনের হৃদয়ের কথা সকল বক্তৃ করিতে লাগিলেন। তখন হেমচন্দ্র, যে যে ঘটনায় মৃগালিনীর প্রতি তাঁহার চিন্তের বিরাগ হইয়াছিল আর যে যে কারণে সেই বিরাগের ধ্বংস হইয়াছিল, তাহা বলিলেন। তখন মৃগালিনী যে প্রকারে স্বর্ষীকেশের গৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, যে প্রকারে নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন, সেই সকল বলিলেন। তখন উভয়েই হৃদয়ের পূর্বোদিত কত ভাব পরস্পরের নিকট ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তখন উভয়েই কত ভবিষ্যৎসম্বন্ধে কল্পনা করিতে লাগিলেন; তখন কতই নূতন নূতন প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইতে লাগিলেন। তখন উভয়ে নিতান্ত নিশ্চয়োজন কত কথাই অতি প্রয়োজনীয়

কথার শ্রায় আগ্রহ সহকারে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তখন কতবার উভয়ে মোক্ষোন্মুখ অশ্রুজল কণ্ঠে নিবারণিত করিলেন। তখন কতবার উভয়ের মুখ প্রতি চাহিয়া অনর্থক মধুর হাসি হাসিলেন;—সে হাসির অর্থ “আমি এখন কত সুখী!” পরে যখন প্রভাতোদয়সূচক পক্ষিগণ রব করিয়া উঠিল, তখন কতবার উভয়েই বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন যে, আজি এখনই রাত্রি পোহাইল কেন?—আর সেই নগর মধ্যে যখনবিপ্লবের যে কোলাহল উচ্ছৃঙ্খিত সমুদ্রের বাঁচি-রববৎ উঠিতেছিল—আজ হৃদয়-সাগরের তরঙ্গরবে সে রব ডুবিয়া গেল।

উপবন-গৃহে আর এক স্থানে আর একটা কাণ্ড হইয়াছিল। দিগ্বিজয় প্রভুর আজ্ঞামত রাত্রি জাগরণ করিয়া গৃহরক্ষা করিতেছিল, মৃগালিনীকে লইয়া যখন হেমচন্দ্র আইসেন, তখন সে দেখিয়া ‘চিনিল। মৃগালিনী তাঁহার নিকট অপরিচিতা ছিলেন না—যে কারণে পরিচিতা ছিলেন, তাহা ক্রমে প্রকাশ পাইতেছে। মৃগালিনীকে দেখিয়া দিগ্বিজয় কিছু বিস্মিত হইল, কিন্তু জিজ্ঞাসার সম্ভাবনা নাই, কি করে? ক্রমেক পরে গিরিজায়াও আসিল দেখিয়া দিগ্বিজয় মনে ভাবিল; “বুঝিয়াছি—ইহারা দুই জন গোড় হইতে আমাদগের দুইজনকে দেখিতে

আসিয়াছে। ঠাকুরাণী যুবরাজকে দেখিতে আনিয়াছেন, আর এটা আমাকে দেখিতে আসিয়াছে সন্দেহ নাই।” এই ভাবিয়া দিগ্বিজয় একবার আপনার গৌপ দাড়ি চুমুরিয়া লইল, এবং ভাবিল, “না হবে কেন ?” আবার ভাবিল, “এটা কিম্ব বড়ই নষ্ট—এক দিনের তরে কই আমাকে ভাল কথা বলে নাই—কেবল আমাকে গালিই দেয়—তবে ও আমাকে দেখিতে আসিবে, তাহার সম্ভাবনা কি ? যাহা হউক একটা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। রাত্রি ত শেষ হইল—প্রভুও ফিরিয়া আসিয়াছেন ; এখন আমি পাশ কাটিয়া একটুকু শুই। দেখি পিয়ারী আমাকে খুঁজিয়া নেয় কি না ?” ইহা ভাবিয়া দিগ্বিজয় এক নিভৃত স্থানে গিয়া শয়ন করিল। গিরিজায়া তাহা দেখিল।

গিরিজায়া তখন মনে মনে বলিতে লাগিল, “আমি ত মৃগালিনীর দাসী—মৃগালিনী এ গৃহের কর্ত্রী হইলেন অথবা হইবেন—তবে ত বাড়ীর গৃহকর্ম করিবার অধিকার আমারই।” এইরূপ মনকে প্রবোধ দিয়া গিরিজায়া একগাছা বাঁটা সংগ্রহ করিল এবং যে ঘরে দিগ্বিজয় শয়ন করিয়া আছে, সেই ঘরে প্রবেশ করিল। দিগ্বিজয় চক্ষু বুজিয়া আছে, পদধ্বনিতে বুঝিল যে, গিরিজায়া আসিল

—মমে বড় আনন্দ হইল—তবে ত গিরিজায়া তাহাকে ভালবাসে। দেখি গিরিজায়া কি বলে? এই ভাবিয়া দিগ্বিজয় চক্ষু বুজিয়াই রছিল। অকস্মাৎ তাহার পৃষ্ঠে হুস্ দাম্ করিয়া ঝাঁটার ঘা পড়িতে লাগিল। গিরিজায়া গলা ছাড়িয়া বলিতে লাগিল, “আঃ মলো ঘর শুলার ময়লা জমিয়া রহিয়াছে দেখ—এ কি? এক মিলে! চোর না কি? মলো মিলে, রাজার ঘরে চুরি!” এই বলিয়া আবার সম্বার্জনীর আঘাত। দিগ্বিজয়ের পিট কাটিয়া গেল।

“ও গিরিজায়া আমি! আমি!”

“আমি! আরে তুই বলিয়াই ত ধাক্কা দিয়া বিছাইয়া দিতেছি।” এই বলবার পর আবার বিরশী সিকা ওজনে ঝাঁটা পড়িতে লাগিল।

“দোহাই! দোহাই! গিরিজায়া! আমি দিগ্বিজয়!”

“আবার চুরি করিতে এনে—আমি দিগ্বিজয়! দিগ্বিজয় কে রে মিলে।” ঝাঁটার বেগ আর থামে না।

দিগ্বিজয় এবার সকাতে কহিল, “গিরিজায়া, আমাকে ভুলিয়া গেলেন?”

গিরিজায়া বলিল, “তোরা আমার সঙ্গে কোন্ পুকষে আলাপ রে মিলে!”

দিগ্বিজয় দেখিল নিস্তার নাই—রণে ভঙ্গ দেওয়াই পরামর্শ । দিগ্বিজয় তখন অনুপায় দেখিয়া উর্দ্ধ্বাসে গৃহ হইতে পলায়ন করিল । গিরিজায়া সম্বার্দজনী হস্তে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল ।

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

পূর্ব পরিচয় ।

প্রভাতে হেমচন্দ্র মাধবাচার্য্যের অশুসন্ধানে যাত্রা করিলেন । গিরিজায়া আসিয়া মৃগালিনীর নিকট বসিল ।

গিরিজায়া মৃগালিনীর হৃৎখের ভাগিনী হইয়াছিল, সহৃদয় হইয়া হৃৎখের সময় হৃৎখের কাহিনী সকল শুনিয়াছিল । আজি সূত্বের দিনে সে কেন সূত্বের ভাগিনী না হইবে ? আজি সেইরূপ সহৃদয়তার সহিত সূত্বের কথা কেন না শুনিবে ? গিরিজায়া ভিখারিণী, মৃগালিনী মহাধনীর কন্যা—উভয়ে এতদূর সামাজিক প্রভেদ । কিন্তু হৃৎখের দিনে গিরিজায়া মৃগালিনীর একমাত্র সূত্ব, সে সময়ে ভিখারিণী আর রাজপুরবধূতে প্রভেদ থাকে

না ; আজি সেই বলে গিরিজায়া মৃগালিনীর হৃদয়ের সুখের অংশাধিকারিণী হইল ।

যে আলাপ হইতেছিল, তাহাতে গিরিজায়া বিস্মিত ও প্রীত হইতেছিল । সে মৃগালিনীকে জিজ্ঞাসা করিল,
“তা এত দিন এমন কথা প্রকাশ কর নাই কি জন্ত ?”

মৃ। এত দিন রাজপুত্রের নিষেধ ছিল, এজন্ত প্রকাশ করি নাই । এক্ষণে তিনি প্রকাশের অনুমতি করিয়াছেন, এজন্ত প্রকাশ করিতেছি ।

গি। ঠাকুরাণি ! সকল কথা বল না ? আমার শুনিয়া বড় তৃপ্তি হবে ।

তখন মৃগালিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন,

“আমার পিতা একজন বৌদ্ধমতাবলম্বী শ্রেষ্ঠী । তিনি অত্যন্ত ধনী ও মথুরারাজের প্রিয়পাত্র ছিলেন—মথুরার রাজকন্ঠার সহিত আমার সখীও ছিল ।

আমি একদিন মথুরার রাজকন্ঠার সঙ্গে নৌকার যমুনার জলবিহারে গিয়াছিলাম । তথায় অকস্মাৎ প্রবল ঝড়ঝুটি আরম্ভ হওয়ার, নৌকা জলমধ্যে ডুবিল । রাজকন্ঠা প্রভৃতি অনেকেই রক্ষক ও নাবিকদের হাতে রক্ষা পাইলেন । আমি ভাসিয়া গেলাম । দৈবযোগে এক রাজপুত্র সেই সময়ে নৌকার বেড়াইতেছিলেন । তাঁহাকে

তখন চিনিতাম না—তিনিই হেমচন্দ্র । তিনিও বাতাসের ভয়ে নৌকা তীরে লইতেছিলেন । জলমধ্যে আমার চুল দেখিতে গাইয়া স্বয়ং জলে গড়িয়া আমাকে উঠাইলেন । আমি তখন অজ্ঞান ! হেমচন্দ্র আমার পরিচয় জানিতেন না । তিনি তখন তীর্থদর্শনে মথুরায় আসিয়াছিলেন । তাঁহার বাসায় আমার লইয়া গিয়া শুশ্রূষা করিলেন । আমি জ্ঞান পাইলে, তিনি আমার পরিচয় লইয়া আমাকে আমার বাপের বাড়ী পাঠাইবার উদ্যোগ করিলেন । কিন্তু তিন দিবস পর্য্যন্ত বড়বৃষ্টি থাকিল না । এরূপ দুর্দিন হইল যে, কেহ বাড়ীর বাহির হইতে পারে না । সুতরাং তিন দিন আমাদের উভয়কে এক বাড়ীতে থাকিতে হইল । উভয়ে উভয়ের পরিচয় পাইলাম । কেবল কুল-পরিচয় নহে—উভয়ের অন্তঃকরণের পরিচয় পাইলাম । তখন আমার বয়স পনের বৎসর মাত্র । কিন্তু সেই বয়সেই আমি তাঁহার দাসী হইলাম । সে কোমল বয়সে সকল বুদ্ধিতাম নী । হেমচন্দ্রকে দেবতার স্থায় দেখিতে লাগিলাম । তিনি যাহা বলিতেন, তাহা পুরাণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল । তিনি বলিলেন, ‘বিবাহ কর !’ সুতরাং আমারও বোধ হইল, ইহা অবশ্য কর্তব্য । চতুর্থ দিবসে, কুর্যোগের

উপশম দেখিয়া উপবাস করিলাম; দিগ্বিজয় উদ্যোগ করিয়া দিল। তীর্থপর্যটনে রাজপুত্রের কুলপুরোহিত সঙ্গে ছিলেন। তিনি আমাদের বিবাহ দিলেন।”

গি। কন্যাসম্প্রদান করিল কে ?

যু। অরুন্ধতী নামে আমার এক প্রাচীন কুটুম্ব ছিলেন। তিনি সম্বন্ধে মার ভগিনী হইতেন। আমাকে বালককাল হইতে লালনপালন করিয়াছিলেন। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন; আমার সকল দৌরাভ্যা সহ করিতেন। আমি তাঁহার নাম করিলাম! দিগ্বিজয়, কোন ছলে পুরমধ্যে তাঁহাকে সংবাদ পাঠাইয়া দিয়া ছলক্রমে হেমচন্দ্রের গৃহে তাঁহাকে ডাকিয়া আনিলাম। অরুন্ধতী মনে জানিতেন, আমি যখনায় ডুবিয়া মরিয়াছি। তিনি আমাকে জীবিত দেখিয়া এতই আহলাদিত হইলেন যে, আর কোন কথাতেই অসম্ভুট হইলেন না। আমি যাহা বলিলাম, তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। তিনিই কন্যা সম্প্রদান করিলেন। বিবাহের পর মাসীর সঙ্গে বাপের বাড়ী গেলাম। সকল সত্য বলিয়া কেবল বিবাহের কথা লুকাইলাম। আমি, হেমচন্দ্র, দিগ্বিজয়, কুলপুরোহিত, আর অরুন্ধতী মাসী ভিন্ন এ বিবাহ আর কেহ জানিত না। অদ্য তুমি জানিলে।

গি। মাধবাচার্য্য জানেন না ?

মু। না। তিনি জানিলে সৰ্বনাশ হইত। মগধ-
রাজ্য তাহা হইলে অবশ্য শুনিতেন। আমার বাপ বৌদ্ধ,
মগধরাজ্য বৌদ্ধের বিষম শত্রু।

গি। ভাল তোমার বাপ যদি তোমাকে এ পর্যাঙ্ক
কুমারী বলিয়া জানিতেন, তবে এত বয়সেও তোমার
বিবাহ দেন নাই কেন ?

মু। বাপের দোষ নাই। তিনি অনেক যত্ন করিয়া-
ছেন, কিন্তু বৌদ্ধ সুপাত্র পাওয়া স্কঠিন ; কেন না বৌদ্ধ-
ধর্ম প্রায় লোপ হইয়াছে। পিতা বৌদ্ধ জামাতা চাহেন,
অথচ সুপাত্রও চাহেন। এরূপ একটা পাওয়া গিয়াছিল,
সে আমার বিবাহের পর। বিবাহের দিন স্থির হইয়া
সকল উদ্যোগও হইয়াছিল। কিন্তু আমি সেই সময়ে
জ্বর করিয়া বসিলাম। পাত্র অশ্রুত বিবাহ করিল।

গি। ইচ্ছাপূর্বক জ্বর করিয়াছিলে ?

মু। হাঁ, ইচ্ছাপূর্বক। আমাদের উদ্যানে একটা
কুয়া আছে, তাহার জল কেহ স্পর্শ করে না। তাহার
পানে বা স্নানে নিশ্চিত জ্বর। আমি রাত্রিতে গোপনে
সেই জলে স্নান করিয়াছিলাম।

গি। আবার সম্বন্ধ হইলে, সেইরূপ করিতে ?

মৃ। সন্দেহ কি ? নচেৎ হেমচন্দ্রের নিকট পলাইয়া যাইতাম ।

গি। মথুরা হইতে মগধ এক মাসের পথ । স্ত্রীলোক হইয়া কাহার সহায়ে পলাইতে ?

মৃ। আহার সহিত সাক্ষাতের জন্য হেমচন্দ্র মথুরায় এক দোকান করিয়া আপনি তথায় রত্নদাস বণিক্ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন । বৎসরে একবার করিয়া তথায় বাণিজ্য করিতে আসিতেন । যখন তিনি তথায় না থাকিতেন, তখন দিগ্বিজয় তথায় তাঁহার দোকান রাখিত । দিগ্বিজয়ের প্রতি আদেশ ছিল যে, যখন আমি সেরূপ আজ্ঞা করিব, সে তখনই সেরূপ করিবে । সুতরাং আমি নিঃসহায় ছিলাম না ।

কথা সমাপ্ত হইলে গিরিজায়া বলিল, “ঠাকুরাণি ! আমি একটা বড় গুরুতর অপরাধ করিয়াছি । আমাকে মার্জনা করিতে হইবে । আমি তাহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে স্বীকৃত আছি ।”

মৃ। কি এমন গুরুতর কান্দ করিলে ?

গি। দিগ্বিজয়টা তোমার হিতকারী তাহা আমি জানিতাম না, আমি জানিতাম ওটা অতি অপদার্থ । এজন্য আমি প্রভাতে তাহাকে ভালরূপে ষা কত ঝাঁটা দিয়াছি । তা ভাল করি নাই ।

মৃগালিনী হাসিয়া বলিলেন, “তা কি প্রায়শ্চিত্ত করিবে?”

গি। ভিতারীর মেয়ের কি বিবাহ হয়?

মৃ। (হাসিয়া) করিলেই হয়।

তবে আমি সে অপদার্থটাকে বিবাহ করিব—আর কি করি?

মৃগালিনী আবার হাসিয়া বলিলেন, “তবে আজি তোমার গায়ে হলুদ দিব।”

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পরামর্শ।

হেমচন্দ্র মাধবাচার্যের বসতিস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, আচার্য্য জপে নিযুক্ত আছেন। হেমচন্দ্র প্রণাম করিয়া কহিলেন,

“আমাদিগের সকল যত্ন বিফল হইল। এখন ভূতোর প্রতি আর কি আদেশ করেন? যখন গোড় অধিকার করিয়াছে। বুঝি, এ ভারতভূমির অদৃষ্টে যবনের দাসত্ব

বিধিলিপি ! নচেৎ বিনা বিবাদে যবনেরা গোড়জয় করিল কি প্রকারে ? যদি এখন এই দেহ পতন করিলে, একদিনের তরেও জন্মভূমি দস্যুর হাত হইতে মুক্ত হয়, তবে এইক্ষণে তাহা করিতে প্রস্তুত আছি । সেই অভিপ্রায়ে রাত্রিতে যুদ্ধের আশায় নগর মধ্যে অগ্রসর হইয়াছিলাম— কিন্তু যুদ্ধ ত দেখিলাম না । কেবল দেখিলাম যে, এক পক্ষ আক্রমণ করিতেছে—অপর পক্ষ পলাইতেছে ।”

মাধবাচার্য্য কহিলেন, “বৎস ! দুঃখিত হইও না । দৈবনির্দেশ কখনও বিফল হইবার নহে । আমি যখন গণনা করিয়াছি যে, যবন পরাভূত হইবে, তখন নিশ্চয়ই জানিও তাহারা পরাভূত হইবে । যবনেরা নবদ্বীপ অধিকার করিয়াছে বটে, কিন্তু নবদ্বীপ ত গোড় নহে । প্রধান রাজা সিংহাসন ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন । কিন্তু এই গোড় রাজ্যে অনেক করপ্রদ রাজা আছেন ; তাহারা ত এখনও বিজিত হয়েন নাই । কে জানে যে, সকল রাজা একত্র হইয়া প্রাণপণ করিলে, যবন বিজিত না হইবে ?”

হেমচন্দ্র কহিলেন, “তাহার অল্পই সম্ভাবনা ।”

মাধবাচার্য্য কহিলেন, “জ্যোতিষী গণনা মিথ্যা হইবার নহে ; অবশ্য সফল হইবে । তবে আমার এক ভ্রম

হইয়া থাকিবে । পূর্কদেশে যবন পরাভূত হইবে—ইহাতে আমরা নবদ্বীপেই যবন জয় করিবার প্রত্যাশা করিয়া ছিলাম । কিন্তু গোড়রাজ্য ত প্রকৃত পূর্ক নহে—কামরূপই পূর্ক । বোধ হয়, তথায়ই আমাদিগের আশা কলবতী হইবে ।”

হে । কিন্তু এক্ষণে ত যবনের কামরূপ যাওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখি না ।

মা । এই যবনেরা ক্ষণকাল স্থির নহে । গোড়ে ইহারা স্থস্থির হইলেই কামরূপ আক্রমণ করিবে ।

হে । তাহাও মানিলাম । এবং ইহারা যে কামরূপ আক্রমণ করিলে পরাজিত হইবে, তাহাও মানিলাম । কিন্তু তাহা হইলে আমার পিতৃরাজ্য উদ্ধারের কি সূপার হইল ?

মা । এই যবনেরা এ পয্যন্ত পুনঃপুনঃ জয়লাভ করিয়া অজের বলিয়া রাজগণমধ্যে প্রতিপন্ন হইয়াছে । ভয়ে কেহ তাহাদের বিরোধী হইতে চাহে না । তাহারা একবার মাত্র পরাজিত হইলে, তাহাদিগের সে মহিমা আর থাকিবে না । তখন ভারতবর্ষীয় তাবৎ আর্য্যবংশীয় রাজারা ধৃতান্ত হইয়া উঠিবেন । সকলে এক হইয়া অস্ত্রধারণ করিলে যবনেরা কত দিন তিষ্ঠিবে ?

হে। গুরুদেব! আপনি আশামাত্রেয়র আশ্রয় লইতেছেন; আমিও তাহাই করিলাম। এক্ষণে আমি কি করিব—আজ্ঞা করুন।

মা। আমিও তাহাই চিন্তা করিতেছিলাম। এ নগরমধ্যে তোমার আর অবস্থিতি করা অকর্তব্য; কেন না যবনেরা তোমার মৃত্যুসাধন সঙ্কল্প করিয়াছে। আমার আজ্ঞা—তুমি অতীত এ নগর ত্যাগ করিবে।

হে। কোথায় যাইব ?

মা। আমার সঙ্গে কামরূপ চল।

হেমচন্দ্র অধোবদন হইয়া, অপ্রতিভ হইয়া, মূঢ় মূঢ় কহিলেন, “মৃগালিনীকে কোথায় রাখিয়া যাইবেন ?”

মাধবাচার্য্য বিস্মিত হইয়া কহিলেন, “সে কি! আমি ভাবিতেছিলাম যে, তুমি কালিকার কথার মৃগালিনীকে চিত্ত হইতে দূর করিয়াছিলে!”

হেমচন্দ্র পূর্বের গায় মূঢ়ভাবে বলিলেন, “মৃগালিনী অত্যাচারী। তিনি আমার পরিণীতা স্ত্রী।”

মাধবাচার্য্য চমৎকৃত হইলেন। রুষ্ট হইলেন। কোত করিয়া কহিলেন, “আমি ইহার কিছু জানিলাম না?”

হেমচন্দ্র তখন আত্মোপাত্ত তাঁহার বিবাহের বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। শুনিয়া মাধবাচার্য্য কিছুকণ মৌনী

হইয়া রহিলেন । কহিলেন, “যে স্ত্রী অসদাচারিণী, সে ত শাস্ত্রানুসারে ত্যাজ্যা । যুগলিনীর চরিত্রসম্বন্ধে যে সংশয় তাহা কালি প্রকাশ করিয়াছি ।”

তখন হেমচন্দ্র বোমকেশের বৃত্তান্ত সকল প্রকাশ করিয়া বলিলেন । শুনিয়া মাধবাচার্য্য আনন্দ প্রকাশ করিলেন । কহিলেন,

“বৎস ! বড় প্রীত হইলাম । তোমার প্রিয়তমা এক্ষণে গুণবতী ভার্য্যাকে তোমার নিকট হইতে বিযুক্ত করিয়া তোমাকে অনেক ক্লেশ দিয়াছি । এক্ষণে আশীর্বাদ করিতেছি, তোমরা দীর্ঘজীবী হইয়া বহুকাল একত্র ধর্ম্মাচরণ কর । যদি তুমি এক্ষণে সস্ত্রীক হইয়াছ, তবে তোমাকে আর আমি আমার সঙ্গে কামরূপ বাইতে অনুরোধ করি না । আমি অগ্রে বাইতেছি । যখন সময় বুঝিবেন, তখন তোমার নিকট কামরূপাধিপতি দূত প্রেরণ করিবেন । এক্ষণে তুমি বধুকে লইয়া মথুরায় গিয়া বাস কর—অথবা অন্য অভিপ্রেত স্থানে বাস করিও ।

এইরূপ কথোপকথনের পর, হেমচন্দ্র মাধবাচার্য্যের নিকট বিদায় হইলেন । মাধবাচার্য্য আশীর্বাদ, আনিজন করিয়া শাস্ত্রলোচনে তাঁহাকে বিদায় করিলেন ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ।

মহম্মদ আলির প্রায়শ্চিত্ত ।

যে রাতে রাজধানী যবন-সেনা-বিপ্লবে পীড়িতা হইতে ছিল, সেই রাতে পশুপতি একাকী কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন। নিশাবশেষে সেনা-বিপ্লব সমাপ্ত হইয়া গেল। মহম্মদ আলি তখন তাঁহার সন্তাষণে আসিলেন। পশুপতি কহিলেন,

“যবন !—প্রিয় সন্তাষণে আর আবশ্যক নাই। এক বার তোমারই প্রিয়সন্তাষণে বিশ্বাস করিয়া এই অবস্থাপন্ন হইয়াছি। বিধর্মী যবনকে বিশ্বাস করিবার যে ফল, তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন আমি মৃত্যু শ্রেয় বিবেচনা করিয়া অন্ত ভরসা ত্যাগ করিয়াছি। তোমাদিগের কোন প্রিয় সন্তাষণ শুনিব না।”

মহম্মদ আলি কহিল, “আমি প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করি—প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে আসিয়াছি। আপনাকে যবনবেশ পরিধান করিতে হইবে।”

পশুপতি কহিলেন, সে বিষয়ে চিন্তা স্থির করুন। আমি এক্ষণে মৃত্যু স্থির করিয়াছি। প্রাণ-ত্যাগ করিতে স্বীকৃত আছি—কিন্তু যবনধর্ম অবলম্বন করিব না।

ম। আপনাকে এক্ষণে যবনধর্ম অবলম্বন করিতে বলিতেছি না। কেবল রাজপ্রতিনিধির তৃপ্তির জন্য যবনের পোষাক পরিধান করিতে বলিতেছি।

প। ব্রাহ্মণ হইয়া কি অন্য স্নেহের বেশ পরিব ?

ম। আপনি ইচ্ছাপূর্বক না পরিলে, আপনাকে বলপূর্বক পরাইব। অস্বীকারে লাভের ভাগ অপমান।

পশুপতি উত্তর করিলেন না। মহম্মদ আলি স্বহস্তে তাঁহাকে যবনবেশ পরাইলেন। কহিলেন, “আমার সঙ্গে আসুন।”

প। কোথায় যাইব ?

ম। আপনি বন্দী—জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি ?

মহম্মদ আলি তাঁহাকে সিংহদ্বারে লইয়া চলিলেন। যে ব্যক্তি পশুপতির রক্ষার নিযুক্ত ছিল, সেও সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

দ্বারে প্রহরিগণের জিজ্ঞাসামতে মহম্মদ আলি আপন পরিচয় দিলেন; এক সঙ্কেত করিলেন। প্রহরিগণ

তাঁহাদিগকে যাইতে দিল। সিংহদ্বার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তিন জনে কিছু দূর রাজপথ অতিবাহিত করিলেন। তখন যখনসেনা নগরমহন সমাপন করিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। সুতরাং রাজপথে আর উপদ্রব ছিল না। মহম্মদ আলি কহিলেন,

“ধর্ম্মাধিকার! আপনি আমাকে বিনা দোষে তিরস্কার করিয়াছেন। বখতিয়ার খিলজির একরূপ অভিপ্রায় আমি কিছুই অবগত ছিলাম না। তাহা হইলে আমি কদাচ প্রবঞ্চকের বার্তাবহ হইয়া আপনার নিকট বাইতাম না। যাহা হউক, আপনি আমার কথায় প্রত্যয় করিয়া একরূপ দুর্দশাপন্ন হইয়াছেন, ইহার যথাগাধ্য প্রায়শ্চিত্ত করিলাম। গঙ্গাতীরে নৌকা প্রস্তুত আছে—আপনি যথেষ্ট স্থানে প্রস্থান করুন। আমি এইখান হইতে বিদায় হই।”

পশুপতি বিশ্বয়োগন্ন হইয়া অবাঞ্ছিত হইয়া রহিলেন। মহম্মদ আলি পুনরপি কহিতে লাগিলেন, “আপনি এই সন্ধিক্ষেত্রে এ নগরী ত্যাগ করিবেন। নচেৎ কাল প্রাতে যবনের সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইলে প্রমাদ ঘটবে। খিলজির আজ্ঞার বিপরীত আচরণ করিবার—; ইহার সাক্ষী এই প্রহরী। সুতরাং আত্মরক্ষার স্বল্প

ইহাকেও দেশান্তরিত করিলাম । ইহাকেও আপনার নৌকার লইয়া যাইবেন ।”

এই বলিয়া মহম্মদ আলি বিদায় হইলেন । পশুপতি কিস্তকাল বিস্ময়াগন্ন হইয়া থাকিয়া গুপ্তাতীরাভিমুখে চলিলেন ।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ।

ধাতুমূর্ত্তির বিসর্জন ।

মহম্মদ আলির নিকট বিদায় হইয়া, রাজপথ অতি-
বাহিত করিয়া পশুপতি ধীরে ধীরে চলিলেন । ধীরে
ধীরে চলিলেন—যবনের কণরাগার হইতে বিমুক্ত হইয়াঃ
ক্রতপদক্ষেপে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মিল না । রাজপথে
যাহা দেখিলেন, তাহাতে আপনার মনোমধ্যে অধপনি^২
ময়িলেন । তাঁহার প্রতিপদে মৃত নাগরিকের দেহ চবণে
বাজিতে লাগিল ; প্রতিপদে শোণিতমিক্তকর্দমে চরণ
আর্দ্র হইতে লাগিল । পথের দুই পার্শ্বে গৃহাবলী জনশূন্য
—বহুগৃহ ভস্মীভূত ; কোথাও বা তপ্ত অঙ্গার এখনও

অগ্নিতেছিল। গৃহান্তরে দ্বার ভয়—গবাক্ ভয়—প্রকোষ্ঠ
ভয়—তহুপরি মৃতদেহ! এখনও কোন হতভাগ্য মরণ-
যন্ত্রণায় অমানুষিক কাতরস্বরে শব্দ করিতেছিল। এ
সকলের মূল তিনিই। দারুণ লোভের বশবর্তী হইয়া
তিনি এই রাজধানীকে অশানভূমি করিয়াছেন। পশুপতি
মনে মনে স্বীকার করিলেন যে, তিনি প্রাণদণ্ডের যোগ্য-
পাত্র বটে—কেন মহম্মদ আলিকে কলঙ্কিত করিয়া কারা-
গার হইতে পলায়ন করিলেন? যখন তাঁহাকে ধৃত
করুক—অভিপ্রেত শাস্তি প্রদান করুক—মনে করিলেন
ফিরিয়া বাইবেন। মনে মনে তখন ইষ্টদেবীকে স্মরণ করি-
লেন—কিন্তু কি কামনা করিবেন? কামনার বিষয় আর
কিছুই নাই। আকাশ প্রতি চাহিলেন। গগন নক্ষত্র-
চন্দ্র-গ্রহমণ্ডলীবিভূষিত সহস্র পবিত্র শোভা তাঁহার চক্ষে
সাহিল না—তীব্র জ্যোতিঃসম্পীড়িতের স্থায় চক্ষু মুদ্রিত
করিলেন। সহসা অনৈসর্গিক ভয় আসিয়া তাঁহার হৃদয়
আচ্ছন্ন করিল—অকারণ ভয়ে তিনি আর পদক্ষেপ
করিতে পারিলেন না। সহসা বলহীন হইলেন। বিশ্রাম
করিবার জন্য পথিমধ্যে উপবেশন করিতে গিয়া দেখিলেন
—এক শবাসনে উপবেশন করিতেছিলেন। শবনিক্রম
রক্ত তাঁহার বসনে এবং অঙ্গে লাগিল। তিনি কণ্টকিত-

কলেবরে পুনরুত্থান করিলেন । আর দাঁড়াইলেন না—
 দ্রুত পদে চলিলেন । সহসা আর এক কথা মনে পড়িল—
 তাঁহার নিজ বাটী ? তাহা কি যখনহস্তে রক্ষা পাইয়াছে ?
 আর সে বাটীতে যে কুমুমময়ী প্রাণ-পুতুলিকে লুকাইয়া
 রাখিয়াছিলেন, তাহার কি হইয়াছে ? মনোরমার কি
 দশা হইয়াছে ? তাঁহার প্রাণাধিকা, তাঁহাকে পাপপথ
 হইতে পুনঃপুনঃ নিবারণ করিয়াছিল, সেও বুঝি তাঁহার
 পাপমাগরের তরঙ্গে ডুবিয়াছে ! এ যখনসেনাপ্রবাহে
 সে কুমুমকলিকা না জানি কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে !

পশুপতি উন্মত্তের ত্রাস আপন ভবনাভিমুখে ছুটিলেন ।
 আপনার ভবনসম্মুখে উপস্থিত হইলেন । দেখিলেন যাহা
 ভাবিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিয়াছে—জলন্ত পর্বতের ত্রাস
 তাঁহার উচ্চচূড় অট্টালিকা অগ্নিময় হইয়া জলিতেছে ।

দৃষ্টিমাত্র হতভাগ্য পশুপতির প্রতীতি হইল যে, যব-
 নেরা তাঁহার পৌরজন সহ মনোরমাকে বধ করিয়া গৃহে
 অগ্নি দিয়া গিয়াছে । মনোরমা যে পলায়ন করিয়াছিল,
 তাহা তিনি কিছু জানিতে পারেন নাই ।

নিকটে কেহই ছিল না যে, তাঁহাকে এ সংবাদ
 প্রদান করে । আপন বিকল চিত্তের সিদ্ধান্তই তিনি গ্রহণ
 করিলেন । হলাহল-কলস পরিপূর্ণ হইল—হৃদয়ের শেষ

তন্ত্রী ছিঁড়িল। তিনি কিয়ৎক্ষণ বিস্ফারিত নয়নে দহমান অট্টালিকা প্রতি চাহিয়া রহিলেন—মরণোন্মুখ পতঙ্গবৎ অল্পক্ষণ বিকলশরীরে একস্থানে অবস্থিতি করিলেন—শেষে মহাবেগে সেই অনলতরঙ্গমধ্যে ঝাঁপ দিলেন। সম্ভ্রম প্রহরী চমকিত হইয়া রহিল।

মহাবেগে পশুপতি জলন্ত দ্বারপথে পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। চরম দগ্ধ হইল—অঙ্গ দগ্ধ হইল—কিন্তু পশুপতি ফিরিলেন না। অগ্নিকুণ্ড অতিক্রম করিয়া তাপন শয়নকক্ষে গমন করিলেন—কাহাকেও দেখিলেন না। দগ্ধ শরীরে কক্ষে কক্ষে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তরমধ্যে যে ছত্র অগ্নি জ্বলিতেছিল—তাহাতে তিনি বাহুদাহ-বজ্রগা অনুভূত করিতে পারিলেন না।

ক্ষণে ক্ষণে গৃহের নূতন নূতন খণ্ড সকল অগ্নি কর্তৃক আক্রান্ত হইতেছিল। আক্রান্ত প্রকোষ্ঠ বিখম শিখা আকাশপথে উত্থাপিত করিয়া ভয়ঙ্কর গর্জন করিতেছিল। ক্ষণে ক্ষণে দগ্ধ গৃহাংশ সকল অশনিসম্পাতশব্দে ভূতলে পড়িয়া যাইতেছিল। ধূমে, ধূলিতে, তৎসঙ্গে লক্ষ লক্ষ অগ্নিস্ফুলিঙ্গে আকাশ অদৃশ্য হইতে লাগিল।

দাবানললংবেষ্টিত আরণ্যগজের শ্মশ্রুপশুপতি অগ্নিমধ্যে ইতস্ততঃ দাসদাসী স্বজন ও মনোরমার অন্বেষণ করিয়া

বেড়াইতে লাগিলেন। কাহারও কোন চিহ্ন পাইলেন না—হতাশ হইলেন। তখন দেবীর মন্দির প্রতি তাঁহার দৃষ্টিপাত হইল। দেখিলেন, দেবী অষ্টভুজার মন্দির অগ্নি কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া জলিতেছে। পশুপতি পতঙ্গবৎ তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, অনলমণ্ডলমধ্যে অদ্বৈত স্বর্ণপ্রতিমা বিরাজ করিতেছে। পশুপতি উন্মত্তের স্থায় কহিলেন,

“মা ! জগদম্মে ! আর তোমাকে জগদম্মা বলিব না। আর তোমার পূজা করিব না। তোমাকে প্রণামও করিব না। অতীশশব আমি স্মারনমোবাকে তোমার সেবা করিলাম—ঐ পদ ধ্যান ইহজন্মে সার করিয়াছিলাম—এখন, মা ! এক দিনের পাপে সর্বস্ব হারাইলাম ! তবে কি জল তোমার পূজা করিয়াছিলাম ? কেনই বা আমি আমার পাপ মতি অপনীত না করিলে ?”

মন্দিরদহন অগ্নি অধিকতর প্রবল হইয়া গর্জিয়া উঠিল। পশুপতি তথাপি প্রতিমা সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, “ঐ দেখ ! ধাতুমূর্তি !—তুমি ধাতুমূর্তি মাত্র, দেবী নহ—ঐ দেখ অগ্নি গর্জিতেছে ! যে পথে আমার প্রাণাধিকা গিয়াছে—সেই পথে অগ্নি তোমাকেও প্রেরণ করিবে। কিন্তু আমি অগ্নিকে এ কাঁতি রাখিতে দিব

না—আমি তোমাকে স্থাপনা করিয়াছিলাম—আমিই তোমাকে বিসর্জন করিব। চল! ইষ্টদেবি! তোমাকে গঙ্গার জলে বিসর্জন করিব।”

এই বলিয়া পশুপতি প্রতিমা উত্তোলন আকাজক্ষায় উভয় হস্তে তাহা ধারণ করিলেন। সেই সময়ে আবার অগ্নি গর্জিয়া উঠিল। তখনই পর্বতবিদারারূপ প্রবল শব্দ হইল,—দক্ষ মন্দির, আকাশপথে ধূলিধুমভঙ্গ সহিত অগ্নি-ফুলিঙ্গরাশি প্রেরণ করিয়া, চূর্ণ হইয়া পড়িয়া গেল। তন্মধ্যে প্রতিমা সহিত পশুপতির সজীবন সমাধি হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ।

অস্তিম কালে ।

পশুপতি স্বয়ং অষ্টভুজার অর্চনা করিতেন বটে—কিন্তু তথাপি তাঁহার নিত্য সেবার জন্ত দুর্গাদাস নামে এক জন ব্রাহ্মণ নিযুক্ত ছিলেন। নগরবিপ্লবের পর দিবস দুর্গাদাস শ্রুত হইলেন যে, পশুপতির গৃহ ভস্মীভূত হইয়া ভূমিসাৎ হইয়াছে। তখন ব্রাহ্মণ অষ্টভুজার মূর্তি ভস্ম হইতে উদ্ধার

করিয়া আপন গৃহে স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। যবনেরা নগর লুণ্ঠ করিয়া তৃপ্ত হইলে, বখতিয়ার খিলিজি অনর্থক নগরবাসীদিগের পীড়ন নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং এক্ষণে সাহস করিয়া বাঙ্গালীরা রাজপথে বাহির হইতেছিল। ইহা দেখিয়া দুর্গাদাস অপরাহ্নে অষ্টভুজার উদ্ধারে পশুপতির ভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পশুপতির ভবনে গমন করিয়া, যথায় দেবীর মন্দির ছিল, সেই প্রদেশে গেলেন। দেখিলেন অনেক ইষ্টকরাশি স্থানান্তরিত না করিলে, দেবীর প্রতিমা বিহীন করিতে পারা যায় না। ইহা দেখিয়া দুর্গাদাস আপন পুত্রকে ডাকিয়া আনিলেন। ইষ্টক সকল অর্ধ জ্বীভূত হইয়া পরস্পর লিপ্ত হইয়াছিল—এবং এখন পর্য্যন্ত সন্তপ্ত ছিল। পিতাপুত্র এক দীর্ঘিকা হইতে জলবহন করিয়া তপ্ত ইষ্টক সকল শীতল করিলেন, এবং বহুকষ্টে তন্মধ্য হইতে অষ্টভুজার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ইষ্টকরাশি স্থানান্তরিত হইলে তন্মধ্য হইতে দেবীর প্রতিমা আবিষ্কৃত হইল। কিন্তু প্রতিমার পাদমূলে—এ কি? সতরে পিতাপুত্র নিরীক্ষণ করিলেন। যে, নবুখোদর মৃতদেহ রহিয়াছে! তখন উভয়ে মৃতদেহ উত্তোলন করিয়া দেখিলেন যে, পশুপতির দেহ।

বিস্ময়শূচক বাক্যের পর দুর্গাদাস কহিলেন, “যে প্রকারেই প্রভুর এ দশা হইয়া থাকুক, ব্রাহ্মণের এবধ প্রতিপালিতের কার্য আমাদের অবশ্য কর্তব্য। গঙ্গা-তীরে এই দেহ লইয়া আমরা প্রভুর সৎকার করি চল।”

এই বলিয়া দুইজনে প্রভুর দেহ বহন করিয়া গঙ্গা-তীরে লইয়া গেলেন। তথায় পুত্রকে শবরকার নিযুক্ত করিয়া দুর্গাদাস নগরে কাষ্ঠাদি সংকারের উপযোগী সামগ্রীর অনুসন্ধানে গমন করিলেন। এবং যথাসাধ্য সুগন্ধি কাষ্ঠ ও অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া গঙ্গাতীরে প্রেত্যাগমন করিলেন।

তখন দুর্গাদাস পুত্রের আহুকুল্যে যথাসাধ্য দাহের পূর্বগামী ক্রিয়া সকল সমাপন করিয়া সুগন্ধি কাষ্ঠে চিত্রা রচনা করিলেন। এবং তদুপরি পশুপতির মূর্তি দেহ স্থাপন করিয়া অগ্নিপ্রদান করিতে গেলেন।

কিন্তু অকস্মাৎ শ্মশানভূমিতে এ কাহার আবির্ভাব হইল? ব্রাহ্মণের বিক্ষিপ্তলোচনে দেখিলেন যে, এক মলিনবসনা, কককেন্দী, আনুসারিতকুঁতলা, তন্দ্রধূলি-সংসর্গে বিবর্ণা, উন্মাদিনী আসিয়া শ্মশানভূমিতে অবতরণ করিতেছে। রমণী ব্রাহ্মণদিগের নিকটবর্তিনী হইলেন। দুর্গাদাস স্তম্ভহিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কে?”

রমণী কহিলেন, “তোমরা কাহার লংকার করিতেছ ?”

ছর্গাদাস কহিলেন, “মৃত ধর্ম্মাধিকার পশুপতির ।”

রমণী কহিলেন, “পশুপতির কি প্রকারে মৃত্যু হইল ?”

ছর্গাদাস কহিলেন, “প্রাতে নগরে জনরব শুনিয়াছিলাম যে, তিনি ষবনকর্তৃক কারাবদ্ধ হইয়া কোন সুযোগে রাত্ৰিকালে পলায়ন করিয়াছিলেন। অল্প তাঁহার অট্টালিকা ভস্মসাৎ হইয়াছে দেখিয়া, ভস্মমধ্য হইতে অষ্টভুজার প্রতিমা-উদ্ধার-মানসে গিয়াছিলাম। তথায় গিয়া প্রভুর মৃতদেহ পাইলাম।”

রমণী কোন উত্তর করিলেন না। গঙ্গাতীরে, সৈকতের উপর উপবেশন করিলেন। বহুক্ষণ নীরবে থাকিয়া দ্বিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমরা কে ?” ছর্গাদাস কহিলেন, “আমরা ব্রাহ্মণ ; ধর্ম্মাধিকারের অগ্নে প্রতিপালিত হইয়াছিলাম। আপনি কে ?”

তরুণী কহিলেন, “আমি তাঁহার পত্নী ।”

ছর্গাদাস কহিলেন, “তাঁহার পত্নী বহুকাল নিরুদ্দিষ্টা।

আপনি কি প্রকারে তাঁহার পত্নী ?”

বুকতী কহিলেন, “আমি সেই নিরুদ্দিষ্টা কেশবকন্যা সন্ন্যাসরূপে পিতা আমাকে এতকাল বুদ্ধাধিত রাখিয়া-

ছিলেন। আমি আজ কালপূর্ণে বিধিগণি পুরাইবার জন্য আসিয়াছি।”

তুমি পিতাপুত্র শিহরিয়া উঠিলেন। তাহাদিগকে নিরন্তর দেখিয়া বিধবা বলিতে লাগিলেন, “এখন স্বীকার্তির কর্তব্য কাজ করিব। তোমরা উদ্যোগ কর।”

হুর্গাদাস তরুণীর অভিপ্রায় বুঝিলেন। পুত্রের মুখ চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি বল ?”

পুত্র কিছু উত্তর করিল না। হুর্গাদাস তখন তরুণীকে কহিলেন, “মা, তুমি বলিকা—এ কঠিন কার্যে কেন প্রস্তুত হইতেছ ?”

তরুণী ক্রভঙ্গী করিয়া কহিলেন, “ব্রাহ্মণ হইয়া অধর্মে প্রবৃত্তি দিতেছ কেন ?—ইহার উদ্যোগ কর।”

তখন ব্রাহ্মণ আরোজন জন্ত নগরে পুনর্বার চলিলেন। গমনকালে বিধবা হুর্গাদাসকে কহিলেন, “তুমি নগরে যাইতেছ। নগরপ্রান্তে রাজার উপবনবাটিকায় হেমচন্দ্র নামে বিদেশী রাজপুত্র বাস করেন। তাঁহাকে বলিও, মনোরমা, গঙ্গাতীরে চিতারোহণ করিতেছে—তিনি আসিয়া একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাউন, তাঁহার নিকট ইহলোকের মনোরমার এই কথা তিলা।”

হেমচন্দ্র যখন ব্রাহ্মণমুখে শুনিলেন যে, মনোরমা

পশুপতির পত্নীপরিচয়ে তাঁহার অস্থিতা হইতেছেন, তখন তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ছুর্গাদাসের সমভি-
বাহারে গঙ্গাতীরে আসিলেন। তথায় মনোরমার অতি
মলিনা, উন্মাদিনী মূর্তি, তাঁহার স্থিরগুস্তীর, এখনও
অনিন্দ্যসুন্দর, মুখকান্তি দেখিয়া তাঁহার চক্ষুর জল
আপনি বহিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, “মনোরমা!
ভগিনি! এ কি এ?”

তখন মনোরমা, জ্যোৎস্নাপ্রদীপ্ত সরোবরতুল্য স্থির
মূর্তিতে গৃহগুস্তীরস্বরে কহিলেন, “ভাই, যে জন্তু আমার
জীবন, তাহা আজি চরম সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে। আজ
আমি আমার স্বামীর সঙ্গে গমন করিব।”

মনোরমা সংক্ষেপে অস্ত্রের শ্রবণাতীত স্বরে হেমচন্দ্রের
নিকট পূর্বকথার পরিচয় দিয়া বলিলেন,

“আমার স্বামী অপরিমিত ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া
গিয়াছেন। আমি এক্ষণে সে ধনের অধিকারিণী।
আমি তাহা তোমাকে দান করিতেছি। তুমি তাহা
গ্রহণ করিও। নচেৎ পাপিষ্ঠ যবনে তাহা ভোগ
করিবে। তাহার অল্পভাগ ব্যয় করিয়া জনার্দন শর্মাকে
কাশীধামে স্থাপন করিবে। জনার্দনকে অধিক ধন দিও
না। তাহা হইলে যবনে কাড়িয়া লইবে। আমার দাহের

পক্ষ, তুমি আমার স্বামীর গৃহে গিয়া অর্ধের সন্ধান করিও । আমি যে স্থান বলিয়া দিতেছি, সেই স্থান খুঁড়িলেই তাহা পাইবে । আমি ভিন্ন সে স্থান আর কেহই জানে না ।” এই বলিয়া মনোরমা যথা অর্থ আছে, তাহা বলিয়া দিলেন ।

তখন মনোরমা আবার হেমচন্দ্রের নিকট বিদায় হইলেন । জনার্দনকে ও তাঁহার পত্নীকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া হেমচন্দ্রের দ্বারা তাঁহাদিগের নিকট কত স্নেহ-সূচক কথা বলিয়া পাঠাইলেন ।

পরে ব্রাহ্মণেরা মনোরমাকে যথাশাস্ত্র এই ভীষণ ব্রতে ব্রতী করাইলেন । এবং শাস্ত্রীয় আচারান্তে, মনোরমা ব্রাহ্মণের আনীত নূতন বস্ত্র পরিধান করিলেন । নব বস্ত্র পরিধান করিয়া, দিব্য পুষ্পমালা কর্ণে পরিয়া, পশুপতির প্রজ্বলিত চিতা প্রদক্ষিণপূর্বক, তত্পরি আরোহণ করিলেন । এবং সহস্র আননে সেই প্রজ্বলিত ছতীশনরাশির মধ্যে উপবেশন করিয়া, নিদাঘসন্তপ্ত কুম্বকলিকার গ্রায় অনলতাপে প্রাণত্যাগ করিলেন ।

পরিশিষ্ট ।

হেমচন্দ্র মনোরমার দত্ত ধন উদ্ধার করিয়া তাহার কিসদংশ জনার্দিনকে দিয়া তাঁহাকে কাশী প্রেরণ করিলেন । অবশিষ্ট ধন গ্রহণ করা কর্তব্য কি না, তাহা মাধবাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন । মাধবাচার্য্য বলিলেন, “এই ধনের বলে পশুপতির বিনাশকারী বর্ষতির্য্যার ঋণিজিকে প্রতিফল দেওয়া কর্তব্য ; এবং তদভিপ্রায়ে ইহা গ্রহণও উচিত । দক্ষিণে, সমুদ্রের উপকূলে অনেক প্রদেশ জনহীন হইয়া পড়িয়া আছে । আমার পরামর্শ যে, তুমি এই ধনের দ্বারা তথায় নূতন রাজ্য সংস্থাপন কর, এবং তথায় বনদমনোপযোগী সেনা সজ্জন কর । তৎসাহায্যে পশুপতির শত্রুর নিপাতসিদ্ধ করিও ।”

এই পরামর্শ করিয়া মাধবাচার্য্য সেই রাত্রিতেই হেমচন্দ্রকে নবদ্বীপ হইতে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করাইলেন । পশুপতির ধনরাশি তিনি গোপনে সঙ্গে লইলেন । যুগালিনী, গিরিজায়া এবং দিগ্বিজয় তাহার সঙ্গে গেলেন । মাধবাচার্য্যও হেমচন্দ্রকে নূতন রাজ্য স্থাপিত করিবার

জন্ম তাঁহার সঙ্গে গেলেন । রাজ্য সংস্থাপন অতি সহজ কাজ হইয়া উঠিল, কেন না যবনদিগের ধর্মঘেবিতায় পীড়িত এবং তাঁহাদিগের ভয়ে ভীত হইয়া অনেকেই তাঁহাদিগের অধিকৃত রাজ্য ত্যাগ করিয়া হেমচন্দ্রের নবস্থাপিত রাজ্যে বাস করিতে লাগিল ।

মাধবাচার্য্যের পরামর্শেও অনেক প্রধান ধনী ব্যক্তি তথায় আশ্রয় লইল । এইরূপে অতি শীঘ্র ক্ষুদ্র রাজ্যটি সৌষ্ঠবাবিহিত হইয়া উঠিল । ক্রমে ক্রমে সেনা সংগ্রহ হইতে লাগিল । অচিরে রমণীর রাজপুরী নিশ্চিত হইল । মৃগালিনী তন্মধ্যে মহিষী হইয়া সে পুরী আলো করিলেন ।

গিরিজায়ার সহিত দিগ্বিজয়ের পরিণয় হইল । গিরিজায়া মৃগালিনীর পরিচর্যায় নিযুক্তা রহিলেন, দিগ্বিজয় হেমচন্দ্রের কার্য্য পূর্ববৎ নির্বাহ করিতে লাগিলেন । কথিত আছে যে, বিবাহ অবধি এমন দিনই ছিল না, যে দিন গিরিজায়া এক আধ ঘা কাঁটার আঘাতে দিগ্বিজয়ের শরীর পবিত্র করিয়া না দিত । ইহাতে যে দিগ্বিজয় বড়ই হুঃখিত ছিলেন এমন নহে । বরং একদিন কোন দৈব- কারণবশতঃ গিরিজায়া কাঁটা মারিতে ভুলিয়া ছিলেন, ইহাতে দিগ্বিজয় বিষন্ন বদনে গিরিজায়াকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “গিরি, আজ তুমি আমার উপর রাগ করিয়াছ না

কি ?” বস্তুতঃ ইহারা যাবজ্জীবন পরমশুখে কালাতিপাত করিয়াছিল ।

হেমচন্দ্রকে নূতন রাজ্যে স্থাপন করিয়া মাধবাচার্য্য কামরূপে গমন করিলেন । সেই সময়ে হেমচন্দ্র দক্ষিণ হইতে মুসলমানের প্রতিকূলতা করিতে লাগিলেন । বখতিয়ার খিলিজি পরাভূত হইয়া কামরূপ হইতে দূরীকৃত হইলেন । এবং প্রত্যাগমনকালে অপমানে ও কষ্টে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল । কিন্তু সে সকল ঘটনার বর্ণনা করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে ।

রত্নময়ী এক সম্পন্ন পাটনীকে বিবাহ করিয়া হেমচন্দ্রের নূতন রাজ্যে গিয়া বাস করিলা । তথায় মৃগালিনীর অনুগ্রহে তাহার স্বামীর বিশেষ সৌষ্ঠব হইল । গিরিজায়া ও রত্নময়ী চিরকাল “সই” “সই” রহিল ।

মৃগালিনী মাধবাচার্য্যের দ্বারা ছবীকেশকে অনুরোধ করিয়া মণিমালিনীকে আপন রাজধানীতে আনাইলেন ।

রাজপুরী মধ্যে মৃগালিনীর সখী স্বরূপে বাস করিলেন । তাঁহার স্বামী রাজবাটীর পৌরোহিত্যে নিয়োজিত হইলেন ।

সে দেখিল যে, হিন্দুর আর রাজ্য পাইবার চকন সে আপন চতুরতা ও কর্মদক্ষতা

দেখাইয়া বনদিগের প্রিয়পাত্র হইবার চেষ্টা করিতে
লাগিল। হিন্দুদিগের প্রতি অত্যাচার ও বিশ্বাসঘাতক-
তার দ্বারা শীঘ্র সে মনস্কাম সিদ্ধ করিয়া অভীষ্ট রাজকাৰ্য্যে
নিযুক্ত হইল।

স্নাতা মুড়িবেন না ।

